মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০০২
যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতর

মানবাধিকার চর্চা সম্পর্কিত প্রতিবেদন ২০০২

ঢাকা, ১লা এপ্রিল -- ওয়াশিংটনে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শ্রম বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের বার্ষিক প্রতিবেদনের বাংলাদেশ অংশের পূর্ণ বিবরণী নিচে দেয়া হলোঃ

বাংলাদেশ

বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র বিদ্যমান। এখানে ব্যাপক ক্ষমতা প্রয়োগ করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পার্টির (বিএনপি) নেত্রী খালেদা জিয়া ২০০১ সালের ১লা অক্টোবরে দেশী ও বিদেশী পর্যবেক্ষকদের বিবেচিত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসীন হন। জামাতে ইসলামী, বালাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি) ও ইসলামী ঐক্য জোট (আইওজে)-কে সঙ্গে নিয়ে বিএনপি একটি চার দলীয় জোট সরকার গঠন করে। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা জোরালো এবং সহিংসতা রাজনৈতিক প্রচারাভিযানসহ রাজনীতির সর্বত্র বিরাজমান। একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের (সিজি) তত্ত্বাবধানে ২০০১ সালের ১লা অক্টোবরের নির্বাচন বিক্ষিপ্ত হানাহানি ও বিচ্ছিন্ন অনিয়মের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। সব প্রধান রাজনৈতিক দল বিরোধী দলে থাকাকালে আইন বিষয়ে ও জাতীয় সমস্যায় প্রকৃত বিতর্কে অংশগ্রহণের সামান্যই সুযোগ রয়েছে দাবী করে সংসদ বর্জন করেছে। বিচার বিভাগের উচ্চতর স্তর তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায় স্বাধীনতা প্রদর্শন করেছে এবং প্রায়ই সরকারের বিরুদ্ধে রুল জারি করেছে। অবশ্য নিম্ন আদালত সরকারী সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করতে অনিচ্ছুক এবং দুর্নীতিগ্রস্ত। ১৯২৩ সালের দি অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট দুর্নীতিবাজ সরকারী কর্মচারীদের জনগণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার হাত থেকে রক্ষা করে এবং স্বচ্ছতা ও সরকারের সকল স্তরের জবাবদিহিতাকে বাধাগ্রস্ত করে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করে। এই সব বাহিনীর মুখ্য দায়িত্ব হলো অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা করা। পুলিশ ক্ষমতাসীন দলের সংগে সংশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে তদন্ত চালাতে প্রায়ই অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং সরকার প্রায়ই পুলিশকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকে। পুলিশ বাহিনীতে ব্যাপক দুর্নীতি ও শৃঙ্খলার অভাব রয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীগুলো অসংখ্য গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে এবং এমনকি অত্যন্ত গর্হিত কাজের জন্যও তাদের কদাচিৎ শাস্তি দেয়া হয়েছে।

আনুমানিক ১৩ কোটি ১২ লাখ জনসংখ্যার মাথা পিছু বার্ষিক আয় প্রায় ৩৭৫ ডলার। অর্থনীতি বাজারমুখী, কিন্তু সরকার অধিকাংশ সেবা প্রতিষ্ঠান, অনেক পরিবহন কোম্পানি এবং বৃহৎ নির্মাণ ও বিতরণ প্রতিষ্ঠানের মালিক। একটি ক্ষুদ্র এলিট গোষ্ঠী বেসরকারী অর্থনীতির অধিকাংশ নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিকাশমান। বিদেশী বিনিয়োগ গ্যাস খাত, বিদ্যুৎ উৎপাদন স্থাপনায় কেন্দ্রীভূত। রপ্তানি থেকে আয় ৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদেশী সাহায্য জাতীয় আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়ে রয়েছে। সংস্কারের মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের প্রয়াস আমলাতান্ত্রিক একগুঁয়েমি, কায়েমী অর্থনৈতিক স্বার্থ, ব্যাপক বিস্তৃত দুর্নীতি ও রাজনৈতিক মেরুকরণের

কারণে প্রায়ই বাধাপ্রাপ্ত হয়। অর্থনৈতিক সংস্কারের ব্যাপারে সরকারের প্রতিশ্রুতিতে কোন ধারাবাহিকতা নেই যদিও সরকার সরকারী মালিকানাধীন লোকসানী প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়াসহ কয়েকটি দুরূহ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সরকারের মানবাধিকার রেকর্ড খারাপ রয়েছে এবং সরকার অসংখ্য গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলেছে। নিরাপত্তা বাহিনীগুলো একাধিক বিচার বিভাগ বহির্ভূত হত্যাকান্ড সংঘটিত করে এবং হেফাজতে মৃত্যুর সংখ্যা ২০০১ সালের চেয়ে দ্বিগুণ। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো প্রায়ই সহিংসতায় লিপ্ত হয়, যার কারণে হতাহতের ঘটনা ঘটে। সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী নিজের হাতে আইন তুলে নেয়ার কারণে অসংখ্য হতাকান্ড ঘটেছে। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের সময় নিয়মিতভাবে নির্যাতন, প্রহার ও অন্যান্য ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন করে থাকে। সরকার নির্যাতন অথবা বেআইনী মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের কদাচিৎ শাস্তি দিয়ে থাকে। কারাগারের অবস্থা অত্যন্ত করুণ।

সরকার স্বেচ্ছাচারিতার সংগে গ্রেফতার ও আটক এবং বিশেষ ক্ষমতা আইন (এসপিএ) এবং ফৌজদারী দন্ড বিধির ৫৪ ধারা প্রয়োগ করে চলেছে। এই সব আইনে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করা ও নিবর্তনমূলক আটক রাখা যায়। সরকার জন নিরাপত্তা আইন (পিএসএ), যাতে জামিনের কোন ব্যবস্থা ছিল না, তার বদলে দ্রুত বিচার আইন (এসটিএ) প্রণয়ন করেছে। এই আইনে দ্রুত বিচার ও জামিনের বিধান রয়েছে। বিচার বিভাগের নিম্নস্তর নির্বাহী শাখার প্রভাবাধীন ও দুর্নীতিগ্রস্ত। বিচার বিভাগে বিপুল সংখ্যক মামলা অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে। বিচারের পূর্বে দীর্ঘ কাল ধরে আটক রাখা একটি সমস্যা। পুলিশ বিনা ওয়ারেন্টে ঘরবাড়িতে তলাশি চালায় এবং সরকার অবৈধ বস্তিবাসীদের জোর করে অন্যত্র সরিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে সকল সাংবাদিকই কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বআরোপিত সেন্সরশীপ প্রয়োগ করে থাকে। সাংবাদিকদের ওপর হামলা ও তাদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের জন্য সরকারী কর্মকর্তা, রাজনৈতিক দলের কর্মী, ও অন্যদের প্রয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার সমাবেশের স্বাধীনতা, বিশেষ করে রাজনৈতিক বিরোধীদের সমাবেশের স্বাধীনতাকে সীমিত করেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে চলাচলের স্বাধীনতাকেও সীমিত করেছে। সরকার সাধারণতঃ বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার গ্রুপগুলোকে তাদের কর্মকান্ড চালাতে দিয়ে থাকে, কিন্তু কিছু সংখ্যক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে (এনজিও)-কে নিবিড় পরীক্ষা নিরীক্ষার অধীনে এনেছে। শিশু নির্যাতন ও শিশু পতিতাবৃত্তি একটি সমস্যা। নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা ও বৈষম্য একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে রয়েছে। পঙ্গু, আদিবাসী মানুষ ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সমাজে হেয় দৃষ্টিতে দেখা একটি সমস্যা। সরকার শ্রমিকদের অধিকার, বিশেষ করে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) শ্রমিকদের অধিকার সীমিত করেছে এবং যেসব অধিকার বলবৎ রয়েছে সেগুলো কার্যকর করার ক্ষেত্রে ফলদায়ক ভূমিকা পালন করেনি। ঘরবাড়িতে কর্মরত কিছু ভৃত্য, বিশেষ করে শিশু এমন পরিবেশে কাজ করে যা দাসত্বের সমতুল্য। অনেকের ওপর নির্যাতন করা হয়। শিশু শ্রম ও শিশু শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন ব্যাপক এবং এটি একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে রয়েছে। পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে এবং কোন কোন সময় বাধ্যতামূলক শ্রমের জন্য নারী ও শিশু পাচার গুরুতর সমস্যা হয়ে রয়েছে। ২০০২ সালের নভেম্বর মাসে কোরীয় প্রজাতন্ত্রের সিউলে অনুষ্ঠিত গণতান্ত্রিক দেশগুলোর (কমিউনিটি অব ডেমোক্র্যাসিজ - 'সিডি') আহ্বায়ত গ্রুপ-এর দ্বিতীয় মন্ত্রীপর্যায়ের বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন

অনুচ্ছেদ ১ স্বাধীনতাসহ ব্যক্তিসত্ত্বার অখন্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন

ক. স্বেচ্ছাচারিতার সংগে বা বেআইনীভাবে জীবন হরণ থেকে অব্যাহতি

নিরাপত্তা বাহিনীগুলো বেশ কয়েকটি বিচার বিভাগ বহির্ভূত হত্যাকান্ড ঘটায়। পুলিশ, আধাসামরিক সংগঠন বিডিআর, সহায়ক সংগঠন আনসার এবং সেনাবাহিনী অবাঞ্ছিতভাবে মারাত্মক শক্তি ব্যবহার করেছে।

একটি মানবাধিকার সংগঠনের মতে আলোচ্য বছরে পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর মারাত্মক শক্তি প্রয়োগের কারণে ৮৩ জনের মৃত্যু হয়। এই সকল মৃত্যুর মধ্যে ১৫ জনের মৃত্যু হয় সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে অপরাধ বিরোধী অভিযান "অপারেশন ক্লিন হার্ট" চলার সময়। এই অভিযান শুরু হয় ১৬ই অক্টোবর। আরো ১৪৮ জনের মৃত্যু হয় হেফাজতে। এদের মধ্যে ৩১ জনের মৃত্যু হয় অপারেশন ক্লিন হাট চলাকালে সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার ও জিজ্ঞাসাবাদের পর। এই সব মৃত্যু সম্পর্কে সরকারী বিবৃতিগুলোতে প্রথমে জোর দেয়া হয় যে এরা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বা পালাতে গিয়ে পানিতে ডুবে মারা গেছে। যাহোক, ১৮ই নভেম্বর সরকারের মুখ্য তথ্য কর্মকর্তা জানান যে সেনাবাহিনীর হেফাজতে কোন মৃত্যু ঘটেনি (সে দিন পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৩৬।) ২৪শে নভেম্বর তিনি অভিযোগ করেন যে অপারেশন ক্লিন হার্ট-এর সংগে সংশিষ্ট মৃত্যু সম্পর্কে কিছু কিছু সংবাদপত্রের খবর ভিত্তিহীন।

১৯শে এপ্রিল গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া থানায় আওয়ামী লীগের কর্মী জামালুদ্দীন ফকির পুলিশী নির্যাতনে মারা যায়। মানবাধিকার সংগঠনগুলো সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে পুলিশী হেফাজতে নির্যাতনই ফকিরের মৃত্যুর কারণ। সরকার দুজন পুলিশ অফিসারকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে এবং ঘটনাটির তদন্ত করে। এই বিষয়ে মামলা গ্রহণ করতে থানা অস্বীকৃতি জানালে ফকিরের মা স্থানীয় আদালতে একটি হত্যার মামলা দায়ের করেন।

৯ই মে নারায়ণগঞ্জে ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ একটি ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে বাদল নামে এক ব্যক্তিসহ চারজনকে গ্রেফতার করে। বাদলের মা জানায় পুলিশ তার ছেলের ওপর নির্যাতন করে। ১৭ই মে বাদল গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং মারা যায়। তার সাথে আটক এক ব্যক্তি জানায় যে পুলিশ আটক ব্যক্তিদের চোখ বেঁধে নির্যাতন করে। সে বলে যে বাদলের ওপর চালানো হয় সবচেয়ে বেশি নির্যাতন, সম্ভবত তাকে বৈদ্যুতিক শক দেয়া হয়। পুলিশ বাদলের ওপর নির্যাতন চালানোর কথা অস্বীকার করে। বাদলের মা পুলিশের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করলেও হুমকি ও চাপের মুখে তা প্রত্যাহার করেন।

জুন মাসের গোড়ার দিকে বিডিআর সদস্যরা ঢাকায় অপরাধ বিরোধী অভিযানে মোহাম্মদ সোহেলকে হত্যা করে। বিডিআর দাবী করে যে সোহেল ছাদ থেকে পড়ে মারা গেছে। অন্যরা অবশ্য এই দাবীর বিরোধিতা করেছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো জোর দিয়ে বলেছে যে নির্যাতনের কারণেই সোহেলের মৃত্যু ঘটেছে।

২৮শে অক্টোবর একটি সংবাদপত্রের খবরে বলা হয় যে সেনাবাহিনীর সদস্যরা আবুল হোসেন লিটুকে তার হাঁসমুরগীর খামারে প্রহার করে। লিটুর স্ত্রী জানায় সেনাবাহিনীর সদস্যরা দাবী করে যে লিটু "সেভেন স্টার" নামে একটি অপরাধী গোষ্ঠীর সদস্য। তাদের দাবী অনুযায়ী সে অস্ত্র বের করে দিতে না পারায় তার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তারা তার ওপর নির্যাতন চালায়। লিটুর স্ত্রী মেজর কবির ও তাদের দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করলে একটি নিম্ন আদালত পুলিশকে এই ঘটনার তদন্ত চালানোর নির্দেশ দেয়।

৮ই নভেম্বর সেনাবাহিনীর সদস্যরা অপারেশন ক্লিন হার্ট চলার সময় বিএনপি কর্মী আবু সুফিয়ানকে গ্রেফতার করে। সংবাদপত্রের খবরে বলা হয় যে সুফিয়ান ৯ই নভেম্বর জিজ্ঞোসাবাদ চলার সময় অসুস্থ হয়ে মারা যায়। একটি সুরতহাল রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয় এবং ময়নাতদন্ত চালানো হয়। সংবাদপত্রের খবরে বলা হয় যে সুরতহাল রিপোর্টে সুফিয়ানের হাতে ও পায়ে আঘাতের চিহ্ন থাকার কথা উলেখ করা হয়। একটি মানবাধিকার সংগঠনের তদন্তে দেখা যায় যে সেনা সদস্যদের নির্যাতনে আবু সুফিয়ানের মৃত্যু ঘটেছে।

২০০১ সালে ফেব্রুয়ারিতে হাইকোর্ট সকল ফতোয়াকে (ইসলামী আইন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মতামত) বেআইনী বলে রায় দিলে (অনুচ্ছেদ ২.গ দ্রষ্টব্য) এনজিওগুলো এই রায়কে স্বাগত জানিয়ে ঢাকায় একটি সমাবেশের আয়োজন করে। কয়েকটি ইসলামিক গ্রুপ শহরের কয়েকটি রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং এই সমাবেশ বানচালের চেষ্টা করে। এতে সহিংসতায় একজন পুলিশ নিহত হয়। পুলিশ এই হত্যার সংগে জড়িত থাকার দায়ে চার দলীয় বিরোধী জোটের সদস্য আইওজের নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে। হাইকোর্টের রায় প্রত্যাহার ও আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কয়েকজন মুসলিম নেতা হরতালের (সাধারণ ধর্মঘট, যা বিরোধীদল ও অন্যান্য গ্রুপ প্রায়ই ব্যবহার করে থাকে) ডাক দেন। কয়েক হাজার লোক মিছিল করে, যা সহিংস রূপ নেয়। পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী গুলি চালালে ৬ জন নিহত ও আরো ২৫ জন আহত হয়। সংঘর্ষ চলাকালে ১৫ জন পুলিশও আহত হয়। পরে উন্মত্ত জনতা প্রতিশোধ হিসেবে একটি থানার ওপর হামলা চালালে পুলিশ গুলি চালালে আরো তিনজন মারা যায়।

একটি মানবাধিকার সংগঠনের হিসাব অনুযায়ী আলোচ্য বছরে কারাগারে ও পুলিশের হেফাজতে ১১৭ জনের মৃত্যু হয় (অনুচ্ছেদ ১.গ দ্রষ্টব্য)। তাছাড়া, সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে অপরাধ বিরোধী অভিযান অপারেশন ক্লিন হার্ট চলার সময় সন্দেহভাজনদের আটক করলে আরো ৩১ জনের মৃত্যু হয়। অধিকাংশ মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোন শাস্তি হয় না। শাস্তি না হওয়ার এই পরিবেশ মানবাধিকার লঙ্ঘন ও হত্যাকান্ড অবসানে একটি গুরুতর বাধা হয়ে রয়েছে। যাহোক, কোন কোন ঘটনায়, যেখানে হত্যাকান্ডে পুলিশের সংশিষ্টতার প্রমাণ ছিল, সেখানে কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

১৪ই মার্চ নাটোরের জেলা ও সেসন কোর্ট ১৯৯৪ সালে হেফাজতে একটি যুবকের হত্যার দায়ে একজন পুলিশ সাব ইন্সপেকটর সহ আরো নয় জনকে সাজা দেয়। আদালত পুলিশ অফিসারকে ১০ বছরে কারাদন্ড এবং অন্যদের যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়।

দেশের রাজনীতিতে সহিংসতা সর্বদা বিরাজমান, প্রায়ই যার পরিণতিতে মৃত্যু ঘটে (অনুচ্ছেদ ১.গ ও ৩ দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা এবং প্রায়ই কোন একটি দলের বিভিন্ন উপদলের সমর্থকরা মিছিল ও বিক্ষোভ চলাকালে নিজেদের মধ্যে এবং পুলিশের সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মতে আলোচ্য বছরে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত সহিংসতায় ৪২০ জনের বেশি নিহত এবং প্রায় ৮,৭৪১ জন আহত হয়। বিএনপির সমর্থকরা প্রায়ই পুলিশের পরোক্ষ সমর্থন ও সহায়তায় বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমাবেশ ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠান সহিংস উপায়ে ভেঙ্গে দেয় (অনুচ্ছেদ ২.খ দ্রষ্টব্য)। যাহোক হরতাল চলাকালে কোন মৃত্যুর কোন খবর পাওয়া যায়নি।

২রা মে তারিখে পুলিশ ১৯৯৯ সালে বিএনপি কর্মী সজল চৌধুরিকে হত্যার দায়ে ঢাকার ধানমন্ডি এলাকা থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য আলহাজ মকবুল হোসেন ও ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সাবেক ওয়ার্ড কমিশনার মোহাম্মদ সাদেক খান ও আরো ১১ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের

করে। ২৩শে নভেম্বর খানের জামিনের আবেদন বাতিল করে দিয়ে তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। হোসেন ও আরো একজন অভিযুক্তকে জামিন দেয়া হয়। বছর শেষে অভিযুক্ত ১০ জন তখনো পলাতক ছিল।

মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের বিএনপি সমর্থিত চার জন নব নির্বাচিত ওয়ার্ড কমিশনার অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়। ৪ঠা অক্টোবর পুলিশ আটজনকে এই হত্যাকান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করে।

৯ই জুন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ছাত্রী সাবিকুন্নাহার সনি জেসিডির দুটি উপদলের গোলাগুলির মাঝে পড়ে নিহত হয়। সনির মৃত্যুতে ছাত্র ও শিক্ষকদের প্রতিবাদ দেখা দিলে বুয়েট বন্ধ করে দেয়া হয় এবং ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। আগস্টে বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় খুললে ছাত্রগ্রুপগুলো নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদ জানায়।

২০০১ সালের জুন মাসে নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগের একটি অফিসে একটি বোমা বিস্ফোরণে ২০ জন নিহত এবং শতাধিক আহত হয়। আওয়ামী লীগ সরকার এই বোমা বিস্ফোরণের সাথে জড়িত থাকার দায়ে বিএনপি ও ফ্রিডম পার্টির ২৬ জনকে অভিযুক্ত করে। ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয় এবং পরে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। বোমা বিস্ফোরণে নিহত এক মহিলার ছেলে মে মাসে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির ৫৮ জন নেতা কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা খোকন সাহা ও সাবেক আওয়ামী লীগ দলীয় এমপি শামিম ওসমান। অভিযুক্তদের অধিকাংশ হাইকোর্ট থেকে জামিন নিয়েছেন। ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি) মামলাটির তদন্ত করছিল। বিগত প্রশাসনের সময় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাগুলোর তদন্তের জন্য গঠিত একটি কমিশন মধ্য সেপ্টেম্বরে সরকারের কাছে তার রিপোর্ট পেশ করে। কমিশন তার রিপোর্টে আওয়ামী লীগ প্রশাসনের দ্বিতীয়ার্ধে সাতটি বোমা বিস্ফোরণের মধ্যে ছয়টির জন্য শেখ হাসিনা ও তার দলীয় সহকর্মীদের দোষারোপ করে (অনুচ্ছেদ ২.গ দ্রষ্টব্য)।

২০০০ সালের জুলাইতে নিহত বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ছয়জনসহ আট ব্যক্তির হত্যার মামলা অব্যাহত ছিল।

২০০১ সালের এপ্রিলে হাইকোর্ট ১৯৭৫ সালে তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান (সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিতা) ও তার পরিবারের ২১ সদস্যকে হত্যার দায়ে ১৯৯৮ সালে মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত ১৫ জনের মধ্যে ১২ জনের রায় বহাল রাখে। মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত ১২ জনের মধ্যে চারজন হেফাজতে রয়েছে। দেশের বাইরে অবস্থানরত আরো ১১ জনকে তাদের অনুপস্থিতিতে সাজা দেয়া হয়। সুপ্রীম কোর্টের সাত সদস্য বিশিষ্ট আপিল বিভাগের মধ্যে তিন জন মামলার শুনানীতে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং অন্য দুজনকে হাইকোর্ট পর্যায়ে মামলার শুনানীতে অংশ নেয়ায় বাদ দেয়া হয় বলে আপিল প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে রয়েছে। এই মামলাটির সমাপ্তির উদ্দেশ্যে সরকার যদি আপিল বিভাগে এক জন এডহক বিচারপতি নিয়োগ করতেন, তাহলে এই মামলাটি অগ্রসর হতে পারতো। তবে, বছরের শেষ পর্যন্ত কোন বিচারপতি নিয়োগ করা হয়নি।

১৯৭৫ সালের নভেম্বরে কারাগারে আওয়ামী লীগের চারজন সিনিয়র নেতার হত্যার দায়ে অভিযুক্ত আটজনের মধ্যে চার জন কারাগারে আটক রয়েছেন। তাদের বিচার শুরু হয় ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে।

অভিযুক্ত অন্য ১৩ জন, যারা বিদেশে রয়েছে, তাদের অনুপস্থিতিতে বিচার চলে। আটক আটজনের মধ্যে চারজনকে ২০০১ সালের ডিসেম্বরে জামিন দেয়া হয়। আদালতের মাধ্যমে মামলাটির বিচারের লক্ষ্যে সক্রিয় তদ্বির চলছিল।

সংবাদপত্রে জনতার নিজের হাতে আইন তুলে নিয়ে হত্যাকান্ড ঘটানোর খবর সাধারণ ব্যাপার। বিভিন্ন সময় সংবাদপত্রে কথিত ছিনতাইকারীদের জনতা কর্তৃক প্রহার, কখনো কখনো মেরে ফেলার খবর দেয়া হয়। সম্পাদকীয় নিবন্ধে ও সংবাদ ভাষ্যে মন্তব্য করা হয় যে জনতার ক্রমবর্ধমান সহিংসতা আইন শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ার এবং মানুষের এই ধারণার প্রতিফলন যে ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা কোন কাজ করে না।

ভারতের সংগে সীমান্তে সহিংসতা একটি সমস্যা হয়ে রয়েছে। সংবাদপত্রে খবর ও মানবাধিকার গ্রুপগুলোর হিসেব অনুযায়ী সীমান্ত সংঘর্ষে বিগত ৫ বছরে কয়েক শ' নাগরিক নিহত হয়েছে। মানবাধিকার বিষয়ে কর্মরত দেশীয় এনজিওগুলো জানায় যে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী আলোচ্য বছরে ১০৫ জনের মতো নাগরিককে হত্যা করে।

খ. নিখোঁজের ঘটনা

১১ই নভেম্বর পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা মিন্টু ঘোষকে গ্রেফতার করে তার মায়ের কথায় এক অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। ১৭ই নভেম্বর তিনি সুত্রাপুর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করে ঘোষ কোথায় আছে তা জানানোর জন্য থানার ওসিকে অনুরোধ জানায়।

২০০১ সালের আগস্টে লক্ষ্মীপুরের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের ও আরো এক জন অভিযুক্তকে ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে বিএনপি কর্মী নুরুল ইসলামকে অপহরণের দায়ে কারারুদ্ধ করা হয়। সন্দেহভাজন একজনের কারাগারে প্রদত্ত স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তাহের, তার স্ত্রী ও দুই পুত্রসহ ৩১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। সন্দেহভাজন ব্যক্তিটি স্বীকার করে যে সে ও অন্যরা নুরুল ইসলামের মৃতদেহ মেঘনা নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে। ২৩শে অক্টোবর মামলা শুরু হয়। তাহেরের স্ত্রী, তার বড় ছেলে ও আরো ১৭ জন অভিযুক্ত পলাতক রয়েছে। ডিসেম্বরের ২৫ তারিখে মামলাটি চট্টগ্রামে বিভাগীয় বিশেষ আদালতে স্থানান্তরের ঘোষণা দেয়া হয়।

গ. নির্যাতন ও অন্যান্য ধরনের নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তি

সংবিধানে নির্যাতন ও নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর শাস্তিদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যাহোক, পুলিশ গ্রেফতার ও জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় নিয়মিতভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালায় এবং অন্যান্যভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে। হুমকি দেয়া, পেটানো এবং মাঝে মধ্যে বৈদ্যুতিক শক দেয়ার মাধ্যমে নির্যাতন করা হতে পারে। সরকার কদাচিৎ নির্যাতনকারীদের সাজা দিয়ে থাকে এবং শাস্তির ঝুঁকি না থাকায় পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহার অব্যাহত রয়েছে।

২৮শে ফেব্রুয়ারি শেখ হাসিনার সহকারী এ.এফ.এম বাহাউদ্দীন নাসিমকে গ্রেফতার করা হয়। নাসিমের আইনজীবিরা দাবী করেন যে পুলিশ ও সেনা হেফাজতে নাসিমের ওপর প্রচন্ড নির্যাতন করা হয়।

তার হাত পা বেঁধে রাখা হয়, মাথা ঢেকে রাখা হয় এবং উল্টো করে ঝুলিয়ে ঘোরানো হয়। পুলিশ গরম পানি ভর্তি কাচের বোতল দিয়ে তার দেহের বিভিন্ন অংশে আঘাত করে এবং বৈদ্যুতিক শক দেয়। কারাগারে স্বামীকে দেখার পর নাসিমের স্ত্রী ড: সুলতানা শামিম চৌধুরি সাংবাদিকদের জানান যে তিনি তার দেহে আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন। প্রথমে ৫৪ ধারায় আটকের পর নাসিমকে যতো দীর্ঘ সময় পারা যায় কারাগারে আটক রাখার উদ্দেশ্যে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ দায়ের করে। ৩০শে ডিসেম্বর হাইকোর্ট তার আটকাদেশ অবৈধ ঘোষণা করে তাকে মুক্তির আদেশ দেয় (অনুচ্ছেদ ১.ঘ দ্রষ্টব্য)।

৪ঠা এপ্রিল দুজন পুলিশ ঢাকার মহাখালী থেকে এক রেস্তোঁরার মালিক এ.টি. সামসুজ্জামানকে আটক করে এবং চাঁদা দিতে না পারার জন্য প্রহার করে বলে অভিযোগ রয়েছে। গুলশান থানায় পুলিশ তাকে লাথি মারে এবং লাঠি দিয়ে পেটায়। সামসুজ্জামান মানবাধিকার তদন্তকারীদের জানায় যে পুলিশ তার রেস্তোঁরা থেকে অর্থ নিয়েছে।

২৪শে জুলাই পুরুষ ও মহিলা পুলিশ কর্মকর্তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রী হলে প্রবেশ করে এবং ছাত্রীদের টেনে বের করে এবং তাদের প্রহার করে। এই সব ছাত্রীর কয়েক জন পুরুষ পুলিশ কর্তৃক যৌন হয়রানির অভিযোগ করে। পুলিশ ১৮ জন ছাত্রীকে রাতে আটকে রাখে। হামলায় ৩০ জন ছাত্রী আহত হয়। এক সদস্যের বিচার বিভাগীয় কমিশন ঘটনার তদন্ত করে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসকদের ও পুলিশ অফিসারদের ঘটনার জন্য দায়ী সাব্যস্ত করে। কমিশন ক্যাম্পাসের রাজনীতিতে শিক্ষকদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করারও সুপারিশ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি ১৩ই অক্টোবর তারিখে ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে প্রদত্ত রিপোর্টে নয়টি সুপারিশ করে। এই সকল সুপারিশের মধ্যে রয়েছে হলের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বদলি এবং ছাত্রীদের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য অভিযোগকারী ছাত্রী জান্নাতুল কাননের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ। বছর জুড়ে পুলিশ ও বিডিআর সদস্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে কয়েকবার হানা দিয়ে কিছু অস্ত্র উদ্ধার করে। তারা কয়েকজন ছাত্র ও বহিরাগতকে গ্রেফতার করে।

২১শে আগস্ট বিএনপি কর্মীরা আওয়ামী লীগ নেত্রী ছবি রাণী মন্ডলকে বাগেরহাটের রামপালে বিএনপি অফিসে ধরে নিয়ে আসে। তারা হাতুড়ি ও লাঠি দিয়ে তার মুখে, বুকে ও কপালে আঘাত করে। হামলাকারীরা তাকে রাস্তায় ফেলে দেয়ার আগে তাকে উলঙ্গ করে ছবি তুলে রাখে বলে অভিযোগ রয়েছে। বিএনপির স্থানীয় শাখা এই ঘটনায় জড়িত চার জনকে দল থেকে বহিষ্কার করে এবং দলের রামপাল ইউনিটটি বিলুপ্ত করে। এই ঘটনায় জড়িত ১৫ জনের বিরুদ্ধে ছবি রাণী মন্ডলের দায়েরকৃত মামলাটি কর্মকর্তারা চালিয়ে যাচ্ছেন। পুলিশ অভিযুক্ত ১৫ জনের মধ্যে তিন জনকে গ্রেফতার করে। সরকার এই ঘটনায় দায়িত্ব পালনে অবহেলার দরুন একজন পুলিশ কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে এবং পরে তাকে পুনরায় দায়িত্ব দেয়।

অক্টোবরে অপারেশন ক্লিন হার্ট চলাকালে পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে হেফাজতে নেয়। ঐ ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের তার সাথে দেখা করতে দেয়া হয়নি। হেফাজতে থাকার সময় তার চোখ বেঁধে রাখা হয় এবং এক অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাকে উল্টো করে ঝুলিয়ে তার নিতম্ব ও উরুতে দীর্ঘ সময় ধরে পেটানো হয়। জিজ্ঞেসাবাদকারীরা তাকে একজন ভারতীয় চর ও রাষ্ট্রের শত্রু বলে অভিযুক্ত করে এবং তাকে দেশ ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়। তারা তাকে একটি বিদ্যুতায়িত বালতিতে প্রশ্রাব করতে বলে। তাকে কমপক্ষে আরো দুই সপ্তাহ একটি ক্ষুদ্র সেলে আটকে রাখা হয়।

পুলিশ ও অন্যান্য সরকারী হেফাজতে আটক মহিলাদের ধর্ষণ অতীতে একটি সমস্যা হিসেবে ছিল। আলোচ্য বছরে এই ধরনের কোন রিপোর্ট না পাওয়া না গেলেও এটা পরিষ্কার নয় পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে কিনা, না ধর্ষণ অব্যাহত রয়েছে এবং তার কোন খবর দেয়া হচ্ছে না।

হেফাজতের বাইরেও পুলিশ ধর্ষণ করে বলে জানা যায়। একটি মানবাধিকার সংগঠন আলোচ্য বছরে প্রথম ছয় মাসে হেফাজতের বাইরে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তা কর্তৃক সাতটি ধর্ষণের এবং ছয়টি ধর্ষণের অপচেষ্টার ঘটনা লিপিবব্ধ করে।

তাছাড়া, মহিলারা ধর্ষণের বা পারিবারিক বিরোধে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ করলে তাদের প্রায়ই "নিরাপদ হেফাজতে" (কার্যত কারাগারে) আটক রাখা হয়। সেখানে তাদের খারাপ পরিবেশে থাকতে হয় এবং কখনো কখনো হয়রানি ও ধর্ষণের শিকার হতে হয়। আইনে মহিলাদের নিরাপদ হেফাজতে অপরাধীদের সাথে রাখা নিষিদ্ধ করা হলেও পৃথক কোন ব্যবস্থা নেই। চলতি বছর সরকার নিরাপদ হেফাজতে আটক মহিলাদের ভবঘুরে আশ্রয় কেন্দ্র বা এনজিও পরিচালিত আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করতে শুরু করেছে।

পুলিশ বিরোধী দলীয় বিক্ষোভকারীদের মোকাবিলায় প্রায়ই মাত্রাতিরিক্ত, কখনো কখনো মারাত্মক শক্তি প্রয়োগ করে (অনুচ্ছেদ ১.ক ও অনুচ্ছেদ ২.খ দ্রষ্টব্য)।

পুলিশের দুর্নীতি একটি সমস্যা। বিশ্বাসযোগ্য খবর রয়েছে যে পুলিশ নারী ও শিশু পাচারে সহায়তা করে বা জড়িত (অনুচ্ছেদ ৬.চ দ্রষ্টব্য)। জুলাইতে একটি স্বাধীন সংস্থা আইন কমিশন পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করার উদ্দেশ্যে ৫৪ ধারা সংশোধনের সুপারিশ করে। বছরের শেষ নাগাদ সুপারিশ গ্রহণ করা হয়নি। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি বিশেষের কাছ থেকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য এবং রাজনৈতিক সমর্থনপুষ্ট লোকদের জোর করে চাঁদা আদায় একটি সাধারণ ব্যাপার। ব্যবসায়ীরা চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে কয়েক বার ধর্মঘট পালন করে।

মানবাধিকার গ্রুপগুলো ও সংবাদপত্রের খবর থেকে আভাস পাওয়া যায় যে গ্রামাঞ্চলে কথিত নৈতিক অপরাধে মহিলাদের বিরুদ্ধে প্রায়ই ফতোয়ার মাধ্যমে (কোন আলেম কর্তৃক ঘোষণা) বিচার বিভাগ বহির্ভূত বিভিন্ন শাস্তি প্রদানের ঘটনা ঘটে। বেত্রাঘাতের মতো শাস্তিও এগুলোর মধ্যে থাকতে পারে। একটি মানবাধিকার সংগঠন আলোচ্য বছরে এই ধরনের ৩২টি ফতোয়ার ঘটনা লিপিবদ্ধ করে। এই সব ঘটনায় ১৯ জনকে বেত্রঘাত করা হয় এবং অন্যরা শারীরিক নিগ্রহ থেকে শুরু করে সমাজ কর্তৃক এক ঘরে হওয়ার মতো বিভিন্ন শাস্তি দেয়া হয়।

প্রেমে প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তি, ক্রুদ্ধ স্বামী বা প্রতিশোধকামী ব্যক্তিরা কখনো কখনো মহিলাদের মুখে এসিড ছুড়ে মারে (অনুচ্ছেদ ৫ দ্রষ্টব্য)।

কারাগারের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ এবং তা হেফাজতে কোন কোন মৃত্যুর জন্য দায়ী। একটি মানবাধিকার সংগঠন আলোচ্য বছরে হেফাজতে ১৪৮ ব্যক্তির মৃত্যুর খবর জানায় (অনুচ্ছেদ ১.ক দ্রষ্টব্য)। অধিকাংশ কারাগারে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত বন্দী রয়েছে এবং পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার অভাব রয়েছে। সরকারী পরিসংখ্যান থেকে আভাস পাওয়া যায় যে কারাগারগুলোতে বর্তমানে মোটামুটি ৭৫ হাজার আটক রয়েছে, যা এগুলো ধারণ ক্ষমতা ২৫ হাজারের তিন গুণ। কারাগারে আটক ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে ২ হাজার মহিলা ও ১৬ বছরের কম বয়সের আনুমানিক ১২শ' ছেলেমেয়ে। কারাগারে আটক মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৫

শতাংশ সাজাপ্রাপ্ত এবং ৭১ শতাংশের বিচার চলছিল বা বিচারের অপেক্ষায় ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে কারা কক্ষগুলোতে বন্দীদের সংখ্যা এতোই বেশি যে তাদের পালা করে ঘুমাতে হয়। বছরের শেষ নাগাদ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে (ডিইউজে) আটক ছিল ১১,৫০০ বন্দী। এর ধারণ ক্ষমতা ২,৬০০ এর কিছু বেশি। ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকার উত্তরে কাশিপুরে একটি নতুন কারাগার চালু হয়, যদিও এর প্রথম ধাপের নির্মাণ কাজ এখনো শেষ হয়নি। আইন মন্ত্রী মওদুদ আহমেদ সরকারী বার্তা সংস্থাকে জানান যে কাশিপুর কারাগারের প্রথম ধাপের নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শেষ হবে। তবে এই নির্মাণ কাজ কবে শেষ হবে তার কোন নির্দিষ্ট তারিখ তিনি বলেননি।

কারাগারগুলোতে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের খবর রয়েছে। আগস্টে নতুন ইনস্পেকটর জেনারেল অব প্রিজনস ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে গুরুতর অনিয়ম দেখতে পান এবং ১৭ জন কর্মকর্তাকে সেখান থেকে অন্যান্য কারাগারে বদলী করেন। একটি সংবাদপত্রের খবরে জানা যায় যে একজন ডেপুটি ইনস্পেকটর জেনারেল অব পিজনস (ডিআইজি) মৃত্যুর হুমকি পেয়ে চট্টগ্রাম থেকে পালিয়ে গেছে। কারণ তিনি সেখানে অনিয়মের তদন্ত করছিলেন। ডিআইজি ছুরি ও মদসহ অননুমোদিত সামগ্রী ভর্তি দুটি ট্রাক আটক করেছিলেন। ওগুলো আনা হয়েছিল সেখানে আটক কুখ্যাত অপরাধীদের জন্য।

কারাগারগুলোতে সব বন্দীদের প্রতি সমান আচরণ করা হয় না। কারাকক্ষগুলোর তিনটি শ্রেণী রয়েছে: এ, বি, সি। সাধারণ অপরাধী ও নিম্ন স্তরের রাজনৈতিক কর্মীদের সাধারণত আটক রাখা হয় "সি" শ্রেণীর সেলে, যেগুলোর মেঝে প্রায়ই নোংরা, কোন আসবাবপত্র নেই এবং খাবারের মানও নিম্ন। "এ" এবং "বি" শ্রেণীর সেলগুলোর অবস্থা লক্ষণীয়ভাবে উন্নততর। "এ' শ্রেণীর কক্ষগুলো সংরক্ষিত রাখা হয় প্রখ্যাত বন্দীদের জন্য। "বি" শ্রেণীর কক্ষগুলোকে বিবেচনা করা হয় দ্বিতীয় শ্রেণী হিসেবে এবং সেগুলো সংরক্ষিত রাখা হয় সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিশেষের জন্য। "বি" শ্রেণীর সেলে আটক ব্যক্তিরা কাপড়চোপড়ের মতো সামগ্রী পেয়ে থাকে, যা অন্যান্য বন্দী বা বিচারাধীন আটক ব্যক্তিরা পায় না।

আইনে কিশোর অপরাধীদের বয়স্কদের থেকে আলাদাভাবে আটক রাখার বিধান থাকলেও সুযোগ সুবিধার অভাবে অনেককে বয়স্ক বন্দীদের সংগেই কার্যত রাখা হয়।

সাধারণভাবে সরকার আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি (আইসিআরসি)-সহ স্বাধীন মানবাধিকার গ্রুপগুলোকে কারাগার পরিদর্শনের সুযোগ দেয়নি। প্রতিটি কারাগার এলাকায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে সরকার নিযুক্ত কমিটিগুলো প্রতি মাসে কারাগার পরিদর্শন করে। কিন্তু তাদের প্রাপ্ত তথ্যাদি প্রকাশ করা হয় না। জেলা জজও মাঝে মধ্যে কারাগার পরিদর্শন করেন। কিন্তু তার প্রাপ্ত তথ্যাদিও কদাচিৎ প্রকাশ করা হয়।

ঘ. বলপূর্বক গ্রেফতার, আটকাদেশ বা নির্বাসন

সরকার নাগরিকদের বিরুদ্ধে কোন রকম আনুষ্ঠানিক অভিযোগ বা নির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা ছাড়াই তাদেরকে আটক করার জন্য জাতীয় নিরাপত্তা আইন, যেমন ১৯৭৪ সালে বিশেষ ক্ষমতা আইন ব্যবহারসহ বলপূর্বক লোকজনকে গ্রেফতার এবং আটক অব্যাহত রেখেছে। সংবিধানে বলা হয়েছে যে গ্রেফতারকৃত প্রতিটি ব্যক্তিকে আটক করার কারণ জানাতে হবে, তার পছন্দের আইনজীবী নিয়োগের সুযোগ দিতে হবে, ২৪ ঘন্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করতে হবে, এবং ম্যাজিস্ট্রেট আটকাদেশ অব্যাহত রাখার বিষয়টি অনুমোদন না করলে তাকে মুক্তি দিতে হবে। এই সমস্ত চাহিদা পূরণের কথা থাকলেও

সংবিধান নির্দিষ্ট রক্ষাকবজসহ নিবর্তনমুলক আটক অনুমোদন করে। বাস্তবে, কর্তৃপক্ষ প্রায়ই, এমনকি অ-নিবর্তনমুলক আটকের ক্ষেত্রেও, এসব সাংবিধানিক ধারা লঙ্ঘন করে থাকে। ১৯৯৯ সালের এপ্রিলে দুই সদস্যের একটি হাইকোর্ট বেঞ্চ তার এক রায়ে আটকাদেশের আইন ও ক্ষমতা ব্যাপকভাবে অপব্যবহারের জন্য পুলিশ বাহিনীর সমালোচনা করে। এই রায়ের পরেও পুলিশী ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন হয়নি।

ফৌজদারী দন্ডবিধির ৫৪ ধারায় কোন ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বা পরোয়ানা ছাড়াই কোন ব্যক্তিকে অপরাধমুলক কাজে জড়িত থাকার সন্দেহে আটক রাখা যায়। প্রথমে ৫৪ ধারায় আটক কিছু কিছু লোককে পরে কোন অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। অন্যদের কোন প্রকার অভিযোগ দায়ের ছাড়াই মুক্তি দেয়া হয়। একটি মানবাধিকার সংগঠনের হিসাব অনুযায়ী ২০০১ সালের প্রথম ছয় মাসে 'এসপিএ'-র অধীনে মোট ৭৫৫ জনকে আটক করা হয়। কারা কর্তৃপক্ষের উদ্ধৃতি দিয়ে আরেকটি মানবাধিকার সংগঠন 'এসপিএ'-র অধীনে আটকের সংখ্য ৬৫৫ বলে উলেখ্ব করে। এই বছর আটকের কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। অবশ্য ২৩শে ডিসেম্বর সুপ্রীম কোর্টের দুটি হাইকোর্ট বেঞ্চ ১৩৮ জনের আটকাদেশ অবৈধ বলে ঘোষণা করে তাদের মুক্তির আদেশ দেয়। এসব আটক ব্যক্তিকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে পরে 'এসপিএ'-র অধীনে আটক রাখা হয়। সরকার প্রায়ই বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য ও তাদের পরিবারকে হয়রানী করা এবং ভয়ভীতি দেখানোর উদ্দেশ্যে ৫৪ ধারা ব্যবহার করে থাকে। পুলিশ কখনো কখনো আইনগত কর্তৃত্ব ছাড়াই বিক্ষোভ চলাকালে বা তার আগে বিরোধী কর্মীদের আটক করে এবং বিক্ষোভ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের আটকে রাখে। সংবাদপত্রগুলো অর্থ আদায় অথবা ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে পুলিশ কর্তৃক লোকজনকে আটকে রাখার ঘটনা প্রকাশ করে।

'এসপিএ'-র অধীনে সরকার বা কোন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোন ব্যক্তিকে "রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর" কোন কাজ করা থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে ৩০ দিন আটক রাখার আদেশ দিতে পারেন। 'এসপিএ'-র আওতাভুক্ত অন্যান্য অপরাধের মধ্যে রয়েছে চোরাচালান, কালোবাজারি, বা মজুদদারী। ম্যাজিস্ট্রেটকে আটকের ১৫ দিনের মধ্যে আটক ব্যক্তিকে তার আটকের কারণ জানাতে হবে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ৩০ দিনের মধ্যে আটকের কারণ অনুমোদন করতে হবে অথবা আটক ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে হবে। আটক ব্যক্তিকে কোন বিধিভুক্ত অপরাধে অভিযুক্ত করতে হয় না। বাস্তবে আটক ব্যক্তিকে কোন কোন সময় দীর্ঘতর সময়ের জন্য আটকে রাখা হয়। আটক ব্যক্তিরা তাদের আটকাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করতে পারেন এবং সরকার তাদের আশু মুক্তিও দিতে পারেন।

হাইকোর্টের বিচারক অথবা বিচারক হবার উপযুক্ত দুজন ব্যক্তি ও একজন বেসামরিক কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত একটি উপদেষ্টা বোর্ড কর্তৃক চার মাস পর পর 'এসপিএ'-র অধীনে প্রতিটি আটকাদেশ পরীক্ষা করার কথা। ১৯শে জুন হাইকোর্ট জানায় যে সরকারের আটকাদেশ দীর্ঘায়িত করার অধিকার নেই এবং তাই 'এসপিএ'-র অধীনে আটক ব্যক্তিদের ৩০ দিন পর অবশ্যই মুক্তি দিতে হবে যদি না উপদেষ্টা বোর্ড তাদের আটকাদেশ দীর্ঘায়িত করার সুপারিশ করে। আটক ব্যক্তিকে আটকের ১৫ দিনের মধ্যে বা সম্ভবত তারও আগে তার আটকের কারণ আদালতকে জানানোর বিধানকে কর্তৃপক্ষের ওপর বাধ্যতামুলক বলেও হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়। ২৪শে জুন সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায়ের সংগে একমত প্রকাশ করে। সরকার যদি আটকাদেশের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি দিতে পারে, তাহলে আটকাদেশ বহাল থাকবে, অন্যথায় মুক্তি পাবে। 'এসপিএ'-র অধীনে আটক ব্যক্তি যদি তার মামলা ঢাকায় হাইকোর্টে তুলতে পারে, হাইকোর্ট সাধারণতঃ তার পক্ষে রায় দিয়ে থাকে। যা হোক, অনেক আটক ব্যক্তি এতোই গরীব যে তারা তাদের মামলা ম্যাজিস্ট্রেট স্তরের ওপরে নিয়ে যেতে পারেনি অথবা কঠোর আটকাবস্থার কারণে আইনগত পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ পায়নি। ম্যাজিস্ট্রেটরা সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধীন থাকায় তারা কোন মামলা খারিজ করতে অনিচ্ছুক থাকে (অনুচ্ছেদ ১.ঙ দ্রষ্টব্য)। আটক ব্যক্তিদের আইনজীবীর সংগে পরামর্শ করতে দেয়া হয়,

তবে তা সাধারণত অভিযোগ দায়ের করার আগে নয়। উপদেষ্টা বোর্ডের সামনে তাদের প্রতিনিধি হয়ে কোন আইনজীবী উপস্থিত থাকতে পারেন না। আটক ব্যক্তিদের সাথে দর্শনার্থীরা দেখা করতে পারেন। সরকার বিশিষ্ট বন্দীদের দীর্ঘ সময় ধরে কারো সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে দেয়নি।

২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে একটি সংসদীয় উপকমিটির পরিচালিত একটি সমীক্ষা অনুযায়ী ২৬ বছরে এসপিএ'র অধীনে আটক ৬৯,০১০ জনের ৯৮.৮০ শতাংশকে হাইকোর্টে আদেশে মুক্তি দেয়া হয়েছে। সমীক্ষায় জোর দিয়ে বলা হয় যে এসপিএ'র মামলাগুলো সাধারণত এতোই দুর্বল ও অস্পষ্ট ছিল যে কোর্টের আটককৃতদের মুক্তি দেয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। বছরের শেষ নাগাদ এই অবস্থা অব্যাহত ছিল।

২৫শে ফেব্রুয়ারি পুলিশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর বাড়ির কাছে থেকে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (বিসিএল) ১০ জন নেতাকে বিনা ওয়ারেন্টে বা বিনা অভিযোগে গ্রেফতার করে। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ৫৪ ধারায় মামলা দায়ের করে এবং আদালত থেকে সাত দিনের জন্য তাদের হেফাজতে নেয়ার আর্জি করে। ম্যাজিস্ট্রেট এই আর্জি প্রত্যাখ্যান করে তাদের জামিন দেয়। কিন্তু তাদের অবশ্য মুক্তি দেয়া যায়নি কেননা পুলিশ তাদের বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক রাখার অনুরোধ জানিয়েছিল। এই আটকাদেশ চ্যালেঞ্জ করে জয়ী হলে এদের মধ্যে সাতজনকে ২৭শে মার্চ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়। অবশিষ্টদের পরে মুক্তি দেয়া হলেও পরে আবার কয়েক বার গ্রেফতার করা হয়।

৪ঠা মার্চ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত সহকারী এ.এফ.এম. বাহাউদ্দীন কোথায় আছে, সে সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে। প্রেসিডিয়াম জানায় যে বাহাউদ্দীনকে গ্রেফতার করে তাকে কয়েকটি ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত করা হয়। তার সাথে কাউকে দেখা সাক্ষাৎ করতে দেয়া হচ্ছে না এবং তার ওপর নির্যাতন করা হচ্ছে। ৩রা এপ্রিল হাইকোর্ট নাসিম কোথায় আছে এবং কোন কর্তৃপক্ষ তাকে আটকে রেখেছে তা জানানোর জন্য সরকারের ওপর রুল জারি করে। সুপ্রীম কোর্টে আপিল বিভাগ এই আদেশকে স্থগিত রাখে। রাষ্ট্রদ্রোহিতাসহ বিভিন্ন ফৌজদারী অভিযোগে অভিযুক্ত নাসিম কারাগারে আটক ছিল। প্রথমে তাকে ৫৪ ধারায় আটক করে বৈদেশিক মুদ্রা পাচারের অভিযোগ দায়ের করা হয়। ২০০১ সালের জুনে খালেদা জিয়ার মোটর শোভাযাত্রার ওপর সশস্ত্র হামলায় অংশগ্রহণের দায়ে তার বিরুদ্ধে ১২ই এপ্রিল অভিযোগ দায়ের করা হয়। রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলার শুনানী ১৬ই অক্টোবর শুরু হয়। ১৭ই সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট মুদ্রা পাচারের অভিযোগ খারিজ করে দেয়ার জন্য নাসিমের আর্জির ওপর সরকারের বিরুদ্ধে রুল জারি করে। নভেম্বরে হাইকোর্ট সকল অভিযোগের ওপর তাকে জামিন অনুমোদন করে এবং ৩০শে ডিসেম্বর তার আটকাদেশ অবৈধ বলে ঘোষণা করে তাকে মুক্তির আদেশ দেয় (অনুচ্ছেদ ২.ঘ দ্রষ্টব্য)।

১৫ই মার্চ পুলিশ সাবেক প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দীন খান আলমগীরকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার এবং পরে তাকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক করে। বছরের শেষ নাগাদ আলমগীরের বিরুদ্ধে সর্বমোট আটটি মামলা দায়ের করা হয়। এগুলোর মধ্যে ছিল অনুদানের অর্থ আত্মসাৎ, দুর্নীতি ও রাষ্ট্রদ্রোহিতা। ৩রা আগস্ট হাইকোর্ট বিশেষ ক্ষমতা আইনে আলমগীরের আটকাদেশ অবৈধ বলে ঘোষণা করে। সর্বমোট তাকে ছয় মাস আটক রাখা হয়। কথিত আটটি অভিযোগের সবকটিতেই আলমগীরকে জামিন দেয়া হয় এবং তিনি বিচারের অপেক্ষায় রয়েছেন (অনুচ্ছেদ ২.ঘ দ্রষ্টব্য)।

অপারেশন ক্লিন হার্ট চলাকালে সেনাবাহিনী ২০শে অক্টোবর শেখ হাসিনার রাজনৈতিক সচিব সাবের হোসেন চৌধুরিকে গ্রেফতার করে। তাকে দুই দিনের রিমান্ড দেয়া হয় এবং তার বিরুদ্ধে ৫৪ ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। ২৪শে অক্টোবর তার বিরুদ্ধে দুটি মামলা দায়ের করা হয়, একটি ২০০১ সালের জুনে

খালেদা জিয়ার মোটর শোভাযাত্রার ওপর হামলার সাথে সংশিষ্ট, আরেকটি চুরি সংক্রান্ত। হাইকোর্ট নভেম্বরে তার আটকাদেশ অবৈধ বলে ঘোষণা করে এবং কারাগার থেকে তার মুক্তির আদেশ দেয়। ১৪ই ডিসেম্বর হাইকোর্ট জনাব চৌধুরির আটকাদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আবার একটি রুল জারি করে।

সরকার সাবেক এমপি হাজি সেলিম ও কামাল আহমেদ মজুমদার এবং আওয়ামী লীগ নেতা সাঈদ খোকন ও সাবেক ছাত্রলীগ নেতা অসীম কুমার উকিলসহ অনেক বিরোধী দলীয় কর্মীকে গ্রেফতার ও আটক রাখার উদ্দেশ্যে ৫৪ ধারা ও বিশেষ ক্ষমতা আইন ব্যবহার করে।

২রা এপ্রিল সংসদ জন নিরাপত্তা আইন (পিএসএ) বাতিল করে। ২০০০ সালের জানুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগ সরকার এই আইনটি প্রণয়ন করে। রাজনৈতিক বিরোধীদের হয়রানি ও আটক রাখার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ সরকার 'পিএসএ'-র অপব্যবহার করেছিল বলে বিএনপি অভিযোগ করে।

'এসপিএ'-র মতো 'পিএসএ' পুলিশকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছিল, যার আওতায় সামান্য প্রমাণেই বা কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়াই গ্রেফতার করা হয়। 'পিএসএ' প্রত্যাহারের এক সপ্তাহ পর সংসদ দ্রুত বিচার আইন (এসটিএ) অনুমোদন করে। মেয়াদ বৃদ্ধি করা না হলে এটি বলবৎ থাকবে দুই বছর। কতিপয় সুনির্দিষ্ট অপরাধে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের ৩০ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিশেষ আদালতে বিচারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। 'এসটিএ'তে জামিন দেয়ার বিধান রয়েছে, যা 'পিএসএ'-তে ছিল না। তবে আদালতকে জামিন দেয়ার ক্ষেত্রগুলো নথিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই আইনের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে একটি রক্ষাকবজ হিসেবে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করার জন্য দুই থেকে পাঁচ বছর কারাদন্ড দেয়ার বিধান রাখা হয়েছে। লালমনিরহাট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মতিউর রহমানের দায়ের করা একটি রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে ২৩শে জুন হাইকোর্ট 'এসটিএ'কে কোন অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করা হবে না তা ব্যাখ্যা করার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানায়। মতিউর রহমানকে 'এসটিএ'-র অধীনে ১৩ই জুন গ্রেফতার করা হয়। সাধারণভাবে 'এসটিএ'-র ব্যাপক অপব্যবহারের কোন অভিযোগ নেই।

২০০১ সালের নভেম্বরে পুলিশের স্পেশাল ব্র্যাঞ্চ শাহরিয়ার কবিরকে আটক করে এবং তার বিরুদ্ধে বিদেশে রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা চালানোর অভিযোগ দায়ের করার আগে দুই দিন আটকে রাখে। ২০শে জানুয়ারি কবিরকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয় এবং তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলাটি ঝুলছে। ময়মনসিংহের সিনেমা হলগুলোতে কয়েকটি মারাত্মক বোমা বিস্ফোরণের পর পুলিশ ৮ই ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতাসহ কবিরকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে। তার বিরুদ্ধে নাশকতা ও অন্তর্ঘাতমূলক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ দায়ের করা হয়। কবিরকে ১২ই ডিসেম্বর ৩০ দিনের আটকাদেশ দেয়া হয় এবং তার বিরুদ্ধে একটি বৃটিশ টিভির সংগে সংশিষ্ট দুজন বিদেশী সাংবাদিক তাদের এদেশীয় সহযোগীদের নিয়ে আরেকটি মামলায় রাষ্ট্র বিরোধী তৎপরতার অভিযোগ আনা হয়। ১৫ই ডিসেম্বর হাইকোর্ট বিশেষ ক্ষমতা আইনে কবিরের আটকাদেশের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে তাকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার ও চিকিৎসা সুবিধা দেয়ার জন্য সরকারকে আদেশ দেয়। বৃটিশ টিভি মামলায় কবিরকে ১৮ই ডিসেম্বর অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করে। অবশ্য আদালতের আদেশ অনুযায়ী সরকার তাকে আদালতে হাজির করতে ব্যর্থ হয় এবং তিনি বছরের শেষ নাগাদ জেলে ছিলেন।

ফৌজদারী অপরাধের জন্য জামিন দেয়ার একটি ব্যবস্থা রয়েছে। হিংসাত্মক ও অহিংসাত্মক, উভয় ধরনের অপরাধের জন্য সাধারণভাবে জামিন দেয়া হয়। যাহোক আইনের কতিপয় বিধানে জামিন নামঞ্জুর করার ব্যবস্থা রয়েছে। নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংস আচরণের জন্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের

বিধান রয়েছে এই আইনে। আইনে কঠোরতর শাস্তি, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দান, কর্তব্য পালনে অবহেলা বা ইচ্ছাকৃত ব্যর্থতার জন্য তদন্তকারী অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রয়েছে।

কিছু মানবাধিকার গ্রুপ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে বিনা জামিনে আটক রাখার ব্যবস্থা ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার একটি কার্যকর হাতিয়ার।

ফেব্রুয়ারিতে সরকার ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে একজন ভারতীয় ও চারজন বর্মী নাগরিককে মুক্তি দেয়। জানুয়ারিতে হাইকোর্ট তাদের আটকাদেশকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছিল (অনুচ্ছেদ ২.ঘ দ্রষ্টব্য)। বর্মী নাগরিকদের ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বরে ভ্রমণের বৈধ কাগজপত্র ছাড়া দেশে প্রবেশের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় এবং তাদের সর্বোচ্চ পাঁচ মাস কারাদন্ড দেয়া হয়। ভারতীয় নাগরিককে অনুরূপ আইনে ১৯৯৯ সালে গ্রেফতার করা হয় এবং ১৬ মাসের কারাদন্ড দেয়া হয়। হাইকোর্ট রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়া বা তৃতীয় কোন দেশে পাঠানোর জন্য এই পাঁচ জনের অনুরোধ মঞ্জুর করার জন্য সরকারের প্রতি আদেশ জারি করে। এপ্রিলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা সাজার মেয়াদ শেষ করেছে এমন ৭৩১ জন বিদেশীকে প্রত্যাবাসনের সিদ্ধান্ত নেন।

জুলাইতে ফালু মিয়া তার মৃত্যুর দুই মাস পর ২১ বছরের বেশি সময় ধরে বেআইনীভাবে আটক রাখার জন্য একটি ক্ষতিপূরণের মামলায় জয়ী হয়। ফালু মিয়াকে ১৯৭২ সালের আগস্টে একটি ডাকাতির সাথে জড়িতে থাকার দায়ে পুলিশ গ্রেফতার করে। কারাগারে আটক থাকার সময় তাকে কখনো আদালতে হাজির করা হয়নি এবং তাকে তার আটক করার কারণও জানানো হয়নি। তাকে জামিনে মুক্তি দেয়ার ১০ দিন পর আদালত তাকে অভিযোগ থেকে খালাস দেয়।

২৮শে আগস্ট ফারুক মিয়াকে ৩০ মাস আটক থাকার পর কিশোরগঞ্জ কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়। তাকে ভুল করে অন্য কেউ মনে করে আটক রাখা হয়েছিল। একটি মামলায় পুলিশ তাকে ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারিতে আটক করে। কিন্তু তিনি তাতে জড়িত ছিলেন না।

জুনে পুলিশ ১১ বছরের একটি বালককে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠায়। একজন আটক চোরাচালানী তার সহযোগী হিসেবে ওই বালকের ও তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যের নাম বলেছিল। একটি মানবাধিকার সংগঠনের স্থানীয় শাখা বালকটির মুক্তির জন্য আদালতে একটি আর্জি পেশ করে।

২১শে জুলাই হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ মানিকগঞ্জের এক পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে রুল জারি করে। সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়েছিল যে পুলিশ অফিসার একটি সংঘর্ষে অংশ নেয়ার কথিত অভিযোগে ১৮ মাসের একটি শিশুর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিল। হাইকোর্ট শিশুটিকে অভিযোগ থেকে খালাস দেয়ার আদেশ জারি করে।

সরকার রাজনৈতিক কর্মীদের মুক্তি প্রতিহত করতে ধারাবাহিক আটকাদেশ প্রয়োগ করে থাকে।

২৭শে মার্চ তারিখে হাইকোর্ট ২৫শে ফেব্রুয়ারি বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটককৃত ছাত্র লীগের তিন জন শীর্ষস্থানীয় নেতা লিয়াকত শিকদার, নজরুল ইসলাম বাবু এবং রফিকুল ইসলামের আটকাদেশকে অবৈধ ঘোষণা করে তাদের মুক্তির আদেশ প্রদান করে। পুর্বে দায়েরকৃত একটি হত্যা মামলায় অভিযুক্ত দেখিয়ে তাদেরকে জেল গেটে আবার গ্রেফতার করা হয়। ১লা এপ্রিল তারিখে মহানগর দায়রা জজ তাদেরকে অন্ত

র্বতীকালীন জামিন মঞ্জুর করেন তবে তাদের বিরুদ্ধে আরো দুটো মামলা দায়ের করা হয় এবং পুলিশ তাদেরকে পুনরায় গ্রেফতার করে। ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে এক লিখিত আবেদনে শিকদারের মা দাবি করেন যে অব্যাহত নির্যাতনের কারণে শিকদার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সেপ্টেম্বর মাসেই তাদের সবাইকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়।

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এরশাদকে একটি দুর্নীতি মামলায় জরিমানা প্রদান সাপেক্ষে আদালত মুক্তি দেয়ার আদেশ প্রদান করার পর ২০০১ সালের মার্চ মাসে তাকে বিশেষ ক্ষমতা আইনের আওতায় তাকে আটক করা হয়। বছর শেষেও তার নামে বিভিন্ন অভিযোগ বর্তমান ছিল।

১৫ই জুলাই, ২০০২ তারিখে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের জানান যে ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে ক্ষমতা গ্রহণের পর সরকার দেশব্যাপী তার দলের ৪৫০,০০০ সমর্থকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমেদ বলেন যে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আওয়ামী সরকার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে ১৭,০০০ রাজনৈতিক মামলা দায়ের করেছে এবং ৪২৫,০০০ বিরোধীদলীয় কর্মীকে হয়রানি করেছে। মওদুদ আহমেদ বলেন যে আওয়ামী লীগ সরকার সাদেক হোসেন খোকা এমপি-এর বিরুদ্ধে ১৫৪টি এবং আমানউল্লাহ আমান এমপি-এর বিরুদ্ধে ১১৪টি মামলা দায়ের করে। ৩রা মার্চ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী জানান যে ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে ক্ষমতায় আসার পর সরকার ভূতপূর্ব সরকার কর্তৃক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দায়েরকৃত ৯৬০টি মামলায় অভিযুক্ত ১১,৭০৬ ব্যক্তিকে মুক্তি দিয়েছে।

রাজনৈতিক কারণে আটক ব্যক্তিদের সংখ্যা হিসাব করা কঠিন। অনেক রাজনৈতিক কর্মীকে ফৌজদারী অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় আবার অনেক অপরাধীও রাজনৈতিক পরিচয় দাবী করে থাকে। মামলার ভিড় এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানাতে অনিচ্ছার কারণে বিচার ব্যবস্থা রাজনৈতিক উৎসের ফৌজদারি মামলাগুলো কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে পারে না। আটকাদেশগুলোর ওপর নজর রাখা এবং রাজনৈতিক হয়রানির মামলাগুলো প্রতিহত, সনাক্ত ও প্রচার করার মতো কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাসম্পন্ন কোন স্বতন্ত্র সংস্থা নেই। অধিকাংশ আটকাদেশ কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহের জন্য হয়ে থাকে। বিবাদীরা অধিকাংশ মামলায় জামিন পেয়ে থাকে, তবে ভুল অভিযোগ বাতিল বা খারিজ হতে কয়েক বছর লেগে যেতে পারে।

শাসনতন্ত্রে নির্বাসনের বিষয়টি মোকাবিলার মত কোন বিধান নেই তবে দেশের অভ্যন্তরে অবাধে চলাচলের, বিদেশে ভ্রমণ, দেশান্তরী হওয়া এবং প্রত্যাবাসনের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনের বছরে সরকার কাউকে জোর করে নির্বাসনে পাঠায়নি।

ঙ. সুষ্ঠু প্রকাশ্য বিচারের অস্বীকৃতি

সংবিধানে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগের ব্যবস্থা রয়েছে। যাহোক, দীর্ঘ দিন ধরে বিরাজিত সংবিধানের একটি অস্থায়ী বিধান অনুযায়ী নিম্ন আদালতসমূহ নির্বাহী শাখার অংশ হয়ে রয়েছে এবং এগুলো প্রশাসনের প্রভাবাধীন। বিচার বিভাগের উচ্চতর স্তর তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায় স্বাধীনতা প্রদর্শন করে থাকে এবং প্রায়ই ফৌজদারী, দেওয়ানি এবং এমনকি রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত মামলাগুলোর ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে থাকে। যাহোক আইনী প্রক্রিয়ায়, বিশেষ করে নিম্ন পর্যায়ে দুর্নীতি রয়েছে। পুলিশ বাহিনীর মধ্যে

বিরাজিত দুর্নীতি এবং পুলিশি তদন্তের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার অভাব অনেক ক্ষেত্রেই ন্যায় বিচারকে রুদ্ধ অথবা বিলম্বিত করেছে।

পুলিশি নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিবর্গ সাধারণভাবে পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে থাকে কারণ পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে আনীত ফৌজদারী অভিযোগ তদন্তের জন্য কোন স্বাধীন সংস্থা নেই। ২০০১ সালে হাইকোর্ট একটি রায় প্রদান করে বলেছে যে, পুলিশি নির্যাতনের কথিত শিকার কয়েক ব্যক্তির বিচার বিভাগীয় তদন্ত চলাকালে পুলিশের উপস্থিতি একটি বেআইনী ঘটনা।

আদালত ব্যবস্থার দুটি স্তর রয়েছে। নিম্ন আদালত ও সুপ্রীম কোর্ট। উভয় আদালতেই দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার শুনানী হয়। নিম্ন আদালত ম্যাজিস্ট্রেট এবং সেশন ও জেলা জজদের নিয়ে গঠিত। ম্যাজিস্ট্রেটরা সরকারের নির্বাহী শাখার অংশ এবং সেশন ও জেলা জজরা বিচার বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

১৯৯৭ সালে বিচার বিভাগকে নির্বাহী শাখা থেকে পৃথক করার উদ্দেশ্যে হাইকোর্টের প্রদত্ত একটি আদেশ কার্যকর করার পদ্ধতি সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্ট ২০০১ সালের জুন মাসে তার ইতিপূর্বে প্রদত্ত একটি রুলিং পুনরায় নিশ্চিত করে। রুলিং-এ ঘোষণা করা হয় ১৯৯৭ সালের আদেশের কোন কোন উপাদান সংবিধান সংশোধন ছাড়াই বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। সুপ্রীম কোর্ট সরকারকে ঐসব উপাদান আট সপ্তাহের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে আদেশ দেয়। আওয়ামী লীগ সরকার ঐ নির্দেশ বাস্তবায়িত করেনি। ২০০১ সালের আগস্ট মাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন উপদেষ্টা ইশতিয়াক আহমেদ ঘোষণা করেন যে একটি অধ্যাদেশ জারি করে বিচার বিভাগকে নির্বাহী শাখা থেকে পৃথক করা যেতে পারে এবং পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের কাছে অধ্যাদেশটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব ছেড়ে দেন। নবনির্বাচিত সরকার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য একটি মন্ত্রীসভা কমিটি গঠন করে। তবে এই কমিটি সামান্যই অগ্রগতি অর্জন করেছে যার ফলে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ কমিটির সমালোচনা করেছে। সরকারের অনুরোধে আপিল বিভাগ তার নির্দেশ বাস্তবায়নের সময়সীমা কয়েকবার বৃদ্ধি করেছে আর সর্বশেষ সময়সীমা ছিল ২০০৩ সালের ২৬শে জানুয়ারী।

সুপ্রীম কোর্ট দুটি ভাগে বিভক্ত: হাইকোর্ট এবং অ্যাপিলেট কোর্ট। হাইকোর্টে মূল মামলার শুনানি হয় এবং নিম্ন আদালতের মামলার পর্যালোচনা করা হয়। হাইকোর্টের রায়, ডিক্রি, আদেশ, সাজার বিরুদ্ধে আপিলের শুনানীর এক্তিয়ার অ্যাপিলেট কোর্টের। অ্যাপিলেট কোর্টের রায় সকল আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক।

বিচার ব্যবস্থায় লক্ষ লক্ষ মামলা অনিষ্পন্ন অবস্থায় ঝুলে থাকার কারণে আইন মন্ত্রণালয় কুমিলায় একটি পাইলট প্রকল্প চালু করে। এই প্রকল্পে কিছু দেওয়ানি মামলায় 'অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রিজোলিউশন' (এডিআর) বা বিকল্প পন্থায় বিরোধ নিষ্পত্তির সুযোগ দেয়। এই ব্যবস্থায় নাগরিকরা মামলা দায়ের করার আগে কোন আইনজ্ঞের মাধ্যমে তাদের বিরোধ নিষ্পত্তির সুযোগ পায়। সরকারী সূত্রে জানা গেছে ২০০১ সালে ১৫টি জেলার পারিবারিক আদালতে শুরু করা এই পাইলট কার্যক্রমটি খুবই সফল হয়েছে এবং এই এলাকার নাগরিকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছে। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মওদুদ আহমেদের মতে সংশিষ্ট কর্মসূচী বছরের শেষভাগের মধ্যেই বাদবাকি ৪৯টি জেলা পারিবারিক আদালতে সম্প্রসারণ করা হবে।

বছরের গোড়ার দিকে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারকের সংখ্যা পাঁচ থেকে সাতে উন্নীত করা হয় যাতে করে আপিল বিভাগ দুই বেঞ্চে ভাগ হয়ে দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি করতে পারে। একশ'টিরও অধিক বহুল আলোচিত মামলার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা এবং এগুলোর বিচার ত্বরান্বিত করার জন্য বিভিন্ন সরকারী সংস্থাকে নির্দেশনা দেয়ার উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে। একটি মামলায় ঢাকার মহানগরী দায়রা আদালত ২৭ কর্মদিবসে একটি অপহরণ/হত্যা মামলার বিচার সম্পন্ন করে।

২৪শে অক্টোবর রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহমেদ "স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল ফর স্পিডি ট্রায়াল" আদালত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি অধ্যাদেশ স্বাক্ষর করেন। এই সব ট্রাইব্যুনালে ছয়টি বড় ধরনের অপরাধের বিচার অনুষ্ঠিত হবে। এই নতুন আইনে হত্যা, ধর্ষণ, অবৈধ অস্ত্র রাখা, মাদক ও বিস্ফোরক এবং মজুতের মত অপরাধের বিচার হবে। সংসদের অধিবেশনের আগেই এই অধ্যাদেশটি আইনে পরিণত হয়। তবে ২৪শে নভেম্বর এই আইনটি সংসদের অনুমোদন লাভ করে। বিরোধীদল আইনটি অনুমোদনের সময় সংসদ অধিবেশন বর্জন করে। প্রাথমিক পর্যায়ে ত্রিশটি মামলা ট্রাইব্যুনালে বিচারের জন্য পাঠানো হয়। ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন সংশিষ্ট আইনটির শাসনতান্ত্রিক গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে কারণ দর্শানোর জন্য একটি শো'কজ নোটিশ জারি করে।

বিচার কার্য প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। আইনে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আইনজীবীর মাধমে তার প্রতিনিধিত্ব করার, অভিযোগের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করার, সাক্ষী ডাকার এবং সাজার বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। বিবাদীকে রাষ্ট্রের অর্থে আইনজীবী নিয়োগ করা হয় কদাচিৎ। আর্থিক সহায়তা দেয়ার উদ্দেশ্যে কিছু আইন সহায়তা কার্যক্রম রয়েছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের মানুষ প্রায়ই আইনগত প্রতিনিধি নিয়োগের সুযোগ পায় না। শহরাঞ্চলে আইনগত পরামর্শদাতাদের পাওয়া গেলেও কেবল তারাই এর সুযোগ নিতে পারে যাদের ব্যয় বহনের ক্ষমতা রয়েছে। যাহোক, কখনো কখনো আটক ব্যক্তি এবং পুলিশী রিমান্ডে আটক সন্দেহভাজনদের আইনী পরামর্শ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত করা হয়। এসপিএ, পিএসএ এবং নারী ও শিশু নিপীড়ন প্রতিরোধ আইনের আওতায় বিচার সাধারণ বিচারের মতোই, কিন্তু অন্যান্য মামলার মতো এই সব মামলা দীর্ঘ সময়ের জন্য মুলতবী থাকে না। পিএসএ এবং নারী ও শিশু নিপীড়ন প্রতিরোধ আইনের বিধান অনুযায়ী বিশেষ ট্রাইব্যুনালে মামলাগুলোর শুনানী হয় এবং রায় দেয়া হয়। এই সব আইনের আওতায় মামলাগুলোকে অবশ্যই নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তদন্ত করে বিচার সম্পন্ন করার বিধান থাকলেও ঐ সময় সীমার আগে কোন মামলা শেষ না হলে তার কিভাবে নিষ্পত্তি করা হবে, সে ব্যাপারে আইনে অস্পষ্টতা রয়েছে (অনুচ্ছেদ ১.ঘ দ্রষ্টব্য)।

কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার বিচার কার্য অনুষ্ঠিত হতে পারে, যদিও তা কদাচিৎ ঘটে থাকে। ১৯৭৫ সালে জেল হত্যা মামলায় অভিযুক্ত ২১ জনের মধ্যে ১৩ জনের বিচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাদের অনুপস্থিতিতে। শেখ মুজিব ও তার পরিবারের ২১ জন সদস্যকে হত্যার দায়ে ১৯৯৮ সালে সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে আটজনকে বিচার করা হয় তাদের অনুপস্থিতিতে (অনুচ্ছেদ ১.ক দ্রষ্টব্য)। কোন ব্যক্তিকে তার অনুপস্থিতিতে সাজা দেয়া হলে, সে পরে ফিরে এলে তার পুনর্বিচার পাওয়ার কোন স্বয়ংক্রিয় অধিকার নেই। রাষ্ট্র নিযুক্ত আইনজীবী কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, কিন্তু সে তার নিজের পছন্দ মতো আইনজীবী নিয়োগ করতে পারে না। সাজাপ্রাপ্ত হলে সে ব্যক্তি দেশে না ফেরা না পর্যন্ত আপিল দায়ের করতে পারবে না।

আদালত ব্যবস্থার একটি বড় সমস্যা হলো স্তুপীকৃত মামলা। বিচার চলাকালে দীর্ঘ মুলতবী ঘটে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিরা কারাগারে আটক থাকে (অনুচ্ছেদ ১.ঘ দ্রষ্টব্য)। এই অবস্থা এবং বিচার প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির কারণে অনেক ব্যক্তি ন্যায় বিচার পেতে কার্যকরভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

এইসব পরিস্থিতি এবং বিচার ব্যবস্থায় বিরাজিত দুর্নীতির কারণে অনেকেই ন্যায় বিচার পাওয়া থেকে কার্যকরভাবে বঞ্চিত হয়ে থাকে।

ট্র্যান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত একটি স্বাধীন জরিপ অনুযায়ী আদালতে মামলার সংগে সংশিষ্ট ব্যক্তিদের ৬০ শতাংশের বেশি আদালতের কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়েছে।

২০০১ সালের আগস্ট মাসে ভুল পরিচয়ের কারণে আটক ইদ্রিস আলীকে পাঁচ বছর কারাবাসের পর মুক্তি দেয়া হয়। হাই কোর্ট তিনটি পৃথক পৃথক ঘটনায় তার মুক্তির জন্য আদেশ দেয়। কিন্তু এই আদেশগুলো কারাগার কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে পৌঁছায়নি। ইদ্রিসের আইনজীবী জানান যে "প্রতিটি স্তরে ঘুষ না দিলে কোন দলিলই বিচার ব্যবস্থায় তার গন্তব্যে পৌঁছায় না।" শেষ পর্যন্ত হাই কোর্ট ইদ্রিস আলীর মুক্তির আদেশ বেসরকারী কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠায় এবং তাকে মুক্তি দেয়া হয়। আদালতের শরাণাপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা এবং মামলা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার বলে গ্রামের সনাতনী নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প পদ্ধতি গ্রামীণ সমাজে জনপ্রিয়। কিছু লোকের কাছে এই পদ্ধতি আরো বেশি স্বচ্ছ এবং দ্রুত। যাহোক এইসব পদ্ধতিতে অপব্যবহারের সুযোগ থাকে।

সরকার জানায় যে তারা কোন রাজনৈতিক বন্দীকে আটক রাখেনি। কিন্তু বিরোধী রাজনৈতিক দলসমুহ এবং মানবাধিকার পর্যবেক্ষকরা দাবী করছেন যে অনেক বিরোধী দলীয় কর্মীকে তাদের রাজনৈতিক তৎপরতার কারণে ফৌজদারী অপরাধে গ্রেফতার ও সাজা দেয়া হয়েছে। মধ্য জুলাইতে ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই তত্ত্বধায়ক সরকার রাজনৈতিক বন্দীদের মামলা এবং এসপিএ'র অধীনে আটকাদেশগুলো পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে একটি বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করেন। কমিশন সুপারিশ করে যে কিছু সংখ্যক মামলার বিচার করা উচিত এবং অন্যগুলো খারিজ করা উচিত। ২০০১ সালের ডিসেম্বর মাসে নতুন সরকার পূর্ববর্তী সরকারের আমলের রাজনৈতিক মামলাগুলো পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে নিজস্ব বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করে। ৪ঠা মার্চ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেন যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে দায়েরকৃত মামলায় সরকার ১১,৭০৬ জন ব্যক্তিকে মুক্তি দিয়েছে। এপ্রিল মাসে 'পিএসএ' বাতিল আইনে পরিণত হয়। এই আইনের আওতায় সরকারকে ক্ষমতা দেয়া হয় যে 'এসপিএ'-র অধীনে দায়েরকৃত কোন মামলাগুলো প্রত্যাহার করা হবে আর কোনগুলো চালিয়ে যাওয়া হবে (অনুচ্ছেদ ১.ঘ দ্রষ্টব্য)।

চ. গোপনীয়তা, পরিবার, ঘর বা চিঠিপত্র আদানপ্রদানের ব্যাপারে স্বেচ্ছামুলক হস্তক্ষেপ

আইনে বিধান রয়েছে যে কর্তৃপক্ষকে কোন বাড়িতে প্রবেশের আগে বিচার বিভাগীয় ওয়ারেন্ট গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের মতে পুলিশ কদাচিৎ ওয়ারেন্ট গ্রহণ করে এবং এই বিধান লঙ্ঘনকারী অফিসারদের শাস্তি দেয়া হয় না। তাছাড়া বিশেষ ক্ষমতা আইনে বিনা ওয়ারেন্টে তলাশি চালানোর অনুমতি দেয়া হয়েছে।

মে এবং ডিসেম্বর মাসের মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা একজন শীর্ষস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আমির হোসেন আমুর গৃহে তলাশী চালায়। আওয়ামী লীগের সূত্র অনুযায়ী নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা অবৈধ অস্ত্র সন্ধানের অজুহাতে আমুর বাড়ি তছনছ করে এবং তার পত্নীকে গালিগালাজ করে।

২১শে জুন পুলিশ বাহিনী কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়ার আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল মালেকের বাসভবনে কোনরকম ওয়ারেন্ট ছাড়াই তলাশী চালায়। পুলিশ গৃহে অবস্থানরত আব্দুল মালেকের পত্নীসহ অন্যান্যদেরকে হয়রানি করে এবং বলা হয় তারা মালেকের পত্নীর কাপড়চোপড় খুলে ফেলার চেষ্টা করে। পুলিশ এ কথাও বলেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে যে তারা মালেকের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারে যদি মালেকের পরিবার তাদেরকে অর্থ (টাকা) প্রদান করে। একটি মানবাধিকার সংস্থা বলছে যে কর্তৃপক্ষ ঐ ঘটনার সাথে সংশিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

সারা বছর ধরেই পুলিশ এবং বিডিআর তাদের অপরাধবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে রাজনৈতিক কর্মী এবং কথিত অপরাধীদের বাড়িতে কোনরকম তলাশী ওয়ারেন্ট ছাড়াই অভিযান চালায়। ২৯শে মে তারিখে বিডিআর-এর কর্মীরা একজন বিএনপি কর্মী এবং গ্যাস লাইন ঠিকাদার নুরুল হকের বাড়িতে জোর করে প্রবেশ করে তাকে মারধর করতে শুরু করে। স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় তাকে উদ্ধার করা হয়।

সরকার কখনো কখনো লোকজনকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যত্র পুনর্বাসিত করে। আলোচ্য বছরের মার্চ মাসে হাইকোর্ট ঢাকার আমতলীতে গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক একটি বস্তি উচ্ছেদের কার্যক্রম তিন মাসের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে। হাইকোর্ট সরকারকে এই মর্মে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করে যে উচ্ছেদকৃত বস্তি বাসীদের পুনর্বাসন করার জন্য সরকারকে কেন আদেশ প্রদান করা হবে না।

২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৭০ জন যৌনকর্মী টানবাজারের খালি যৌনপল্লীতে প্রবেশের চেষ্টা করে। পুলিশ তাদের বাধা প্রদান করে। কয়েকজন যৌনকর্মী এতে আহত হয় যাদের মধ্যে তিনজনকে হাসপাতালে নেয়া হয়।

পুলিশ কখনও অন্যদের কথিত অপরাধের জন্য পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের শাস্তি দিয়ে থাকে। মে মাসে ঢাকায় দুই জন কথিত অপরাধীকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হয়ে পুলিশ তাদের পরিবারের ১২ জন সদস্যকে গ্রেফতার করে বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক করে। এদের মধ্যে ছিল কথিত অপরাধীদের একজনের ৬০-বছর বয়সী পিতা এবং ৫৩ বছর বয়সী মাতা।

সরকার কখনো কখনো অন্যদের কথিত অপরাধের জন্য পরিবারের সদস্যদের শাস্তি দিয়ে থাকে। আলোচ্য বছরের মে মাসে ঢাকায় দু'জন কথিত সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হয়ে পুলিশ তাদের ১২ জন আত্মীয়স্বজনকে গ্রেফতার করে 'এসপিএ'-এর আওতায় তাদেরকে আটক করে। কথিত অপরাধীদের একজনের ৬০ বছর বয়স্ক পিতা এবং ৫৩ বছর বয়স্কা মাতাকেও আটক করা হয়।

পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইনটিলিজেন্স এবং ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইনটেলিজেন্স (ডিজিএফআই) সরকারের রাজনৈতিক বিরোধী বলে অনুমিত লোকদের সম্পর্কে খবর দেয়া এবং তাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখার উদ্দেশ্যে চর নিয়োগ করে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, মানবাধিকার কর্মী, বিদেশী এনজিও ও সাংবাদিকরা মাঝে মধ্যে এই সব নিরাপত্তা সংস্থা কর্তৃক হয়রানির খবর দেয়। তাছাড়া, বিদেশী মিশনারিরা খবর দেয় যে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনীগুলো এবং অন্যরা তাদের কর্মকান্ডের ওপর ঘনিষ্ঠভাবে নজর রাখে। যাহোক কোন মিশনারি সংস্থাই চলতি বছর হয়রানির খবর দেয়নি।

অনুচ্ছেদ ২ নাগরিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন

ক. বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

সংবিধানে নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রের সংগে বন্ধুত্ব, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতা রক্ষার স্বার্থে অথবা চরিত্র হনন বা কোন অপরাধ সংঘটনে উৎসাহ দান প্রতিরোধে "যুক্তিসংগত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে" বাক স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। যাহোক সরকার কর্তৃক এইসব অধিকার বাস্তবে সীমিত করার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিছু সরকারী নেতৃবৃন্দ ক্ষমতাসীন দলের সদস্যদের দ্বারা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতাকে উৎসাহিত করে।

অতীতে সাংবাদিকরা ১৯২৩ সালের সরকারী গোপনীয়তার আইন বাতিল করার দাবী জানায় এবং চলতি বছর এই আলোচনা আবার দেখা দেয়। এই আইনে সরকারকে তথ্য পরিবেশন করার আগে একজন নাগরিককে প্রমাণ করতে হবে কেন তার ঐ তথ্যের প্রয়োজন। নাগরিকদের ওপর প্রমাণের ভার অর্পণ করে এই আইন দুর্নীতিবাজ সরকারী কর্মকর্তাদের গণ তদারকীর হাত থেকে রক্ষা করছে এবং সকল স্তরে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে বাধাগ্রস্ত করছে।

শত শত দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা বিভিন্ন ধরনের মতামত প্রকাশের বাহন। অধিকাংশ সংবাদপত্র সরকারের সার্বিক নীতিসমূহ সমর্থন করলেও কয়েকটি সংবাদপত্র প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের নীতি ও কর্মকান্ডের সমালোচনা করে থাকে। সরকারী মালিকানাধীন একটি সংবাদ সংস্থা ছাড়াও একটি আন্তর্জাতিক কোম্পানির সংগে যুক্ত একটি বেসরকারী মালিকানাধীন সংবাদ সংস্থাও রয়েছে।

সংবাদ নিবন্ধের ব্যাপক প্রকাশনা সত্ত্বেও "রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস" (আরএসএফ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী তাদের প্রথম একটি প্রকাশনায় বাংলাদেশকে ১৩৯টি দেশের মধ্যে ১১৮ নম্বরে স্থান দিয়েছে। সংগঠনটি বলেছে, "সশস্ত্র বিদ্রোহী আন্দোলন, আধাসামরিক লোকজন অথবা রাজনৈতিক দলসমুহ সার্বক্ষণিকভাবে সাংবাদিকদের জীবনকে বিপদাপন্ন করছে। রাষ্ট্র সাংবাদিকদের রক্ষার জন্য করণীয় সবকিছুই করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং যারা এই ধরনের সহিংসতায় নিয়োজিত তারা তাদের সহিংস কার্যক্রম পরিচালনায় কোন রকম বাধাই পাচ্ছে না। মনে হয় তারা যেন সম্পূর্ণভাবে কোন আইনের আওতায় নেই।"

সংবাদপত্রের মালিকানা ও বিষয়বস্তু সরাসরি সরকারী বিধিনিষেধের আওতাধীন নয়। কিন্তু সরকার চাইলে আর্থিক পন্থা ব্যবহার করে সাংবাদিকদের প্রভাবিত করতে পারে। সরকারী বিজ্ঞাপন ও অনুকূল শুল্কে আমদানিকৃত নিউজপ্রিন্ট অনেক সংবাদপত্রের আর্থিকভাবে টিকে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সরকার বলছে যে সরকারী বিজ্ঞাপণ বন্টনের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা, ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন, সংবাদ পরিবেশনে বস্তুনিষ্ঠতা, উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রচার এবং "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি মনোভাব" সরকার বিবেচনা করে থাকে। অতীতে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের সমালোচনাকারী সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে অনিচ্ছুক ছিল। তবে, মনে হচ্ছে এখন আর সেই অবস্থা নেই।

একুশে টিভি, এটিএন বাংলার মতো কয়েকটি ব্যক্তি মালিকানাধীন কেবল টিভি স্টেশন এবং রেডিও মেট্রোওয়েভের মতো কয়েকটি স্বাধীন সম্প্রচারকেন্দ্র ছাড়া কার্যত সব কটি বেতার ও টিভি স্টেশন সরকারের মালিকানাধীন এবং সরকার সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করে।

২৯শে আগস্ট সুপ্রিম কোর্ট দু'জন বিএনপিপন্থী শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিকের আবেদনক্রমে বেসরকারী খাতে দেশের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ টেলিভিশন কেন্দ্র একুশে টেলিভিশনকে বন্ধ করার আদেশ প্রদান করে। লাইসেন্স প্রক্রিয়ায় অনিয়মের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এই আদালত থেকে আর কোন আপিল করা সম্ভব নয়। একুশে টিভি বন্ধ ঘোষণা এবং এর যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে আদালতে আবেদন দায়ের করা হয়। এই সব আবেদন হাই কোর্ট ১৬ সেপ্টেম্বর খারিজ করে দেয়।

টেলিভিশন ও বেতার, উভয় মাধ্যমেই প্রধান সংবাদ বুলেটিনগুলোতে অধিকাংশ সময় জুড়ে থাকে প্রধানমন্ত্রীর কর্মকান্ড, এবং তার মন্ত্রীসভার সদস্যদের খবর। সংবাদে বিরোধীদল সামান্য স্থান পায়। উভয় বেসরকারী স্টেশনকেই তাদের পরিচালনার শর্তানুসারে কয়েকটি সরকারী সংবাদ কার্যক্রম এবং প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের ভাষণগুলো বিনা অর্থে প্রচার করতে হয়। ১৯৯৮ সালে একটি সরকারী কমিটি বেতার ও টেলিভিশনের স্বায়ত্ত্বশাসনের ক্ষমতা প্রদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে। ১২ই জুন সংসদ রাষ্ট্র পরিচালনাধীন বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) ও বাংলাদেশ বেতার (রেডিও বাংলাদেশ)-কে স্বায়ত্ত্বশাসন দিয়ে দুটি বিল অনুমোদন করে। এই বিল দুটি অনুমোদনের পরও বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতারের প্রকৃত স্বায়ত্ত্বশাসন নিশ্চিত হয়নি। সংবাদ নির্বাচনে সরকারী হস্তক্ষেপ একটি সমস্যা হয়ে রয়েছে। এই সব কেন্দ্রের অনেক সাংবাদিক স্বআরোপিত সেন্সরশীপ প্রয়োগ করে থাকে।

বেসরকারী পক্ষগুলো কর্তৃক মানহানির ফৌজদারী মামলা করলে সাংবাদিক ও অন্যদের কারারুদ্ধ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সংবাদ প্রকাশের কারণে ক্ষমতাসীন দলের কয়েকজন সংসদ সদস্য কয়েকটি সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে একাধিক মানহানির ফৌজদারী মামলা দায়ের করে। এইসব রাজনীতিক এই সব খবরকে মিথ্যা ও মানহানিকর বলে মনে করে। সকল মামলায়ই সাংবাদিকরা আদালত থেকে আগাম জামিন লাভ করেন এবং কোন মামলাই আদালতে ওঠেনি। রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলাগুলো অনিষ্পন্ন অবস্থায় ঝুলছে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিরা জামিনে রয়েছেন।

সংবাদপত্রে সকল সাংবাদিকই প্রকৃতপক্ষে কিছুটা মাত্রায় স্বআরোপিত সেন্সরশীপ প্রয়োগ করে থাকে এবং অনেক সাংবাদিকই স্পর্শকাতর সংবাদ এড়ানোর কারণ হিসেবে সম্ভাব্য হয়রানি, প্রতিশোধ ও শারীরিক ক্ষতির ভয়ের কথা উলেখ করেন। সরকারী নেতৃবৃন্দ, রাজনৈতিক কর্মী ও অন্যদের দ্বারা সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের ওপর সহিংস হামলা এবং তাদের ভীতি প্রদর্শনের প্রয়াস প্রায়ই ঘটে থাকে। রাজনৈতিক দলগুলো এবং তাদের পক্ষের লোকেরা সংবাদ পরিবেশনার কারণে সংবাদ অফিস ও সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালায়। এই সব অপরাধ বহুলাংশে অমীমাংসিত রয়েছে এবং সংবাদপত্রের খবরে এই সব হামলাকারীদের নাম ও দলীয় পরিচয় সনাক্ত করা হলেও তাদের ধরা হয়নি। রাজপথে রাজনৈতিক সহিংসতার সময় সাংবাদিকদের ওপর হামলা একটি সাধারণ ব্যাপার এবং পুলিশী হামলায় কয়েক জন সাংবাদিক আহত হয়।

মার্চ মাসে সরকার পরিচালিত বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বিএসএস) ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ২০ জন সাংবাদিককে চাকুরীচ্যুত করে। পর্যবেক্ষরা মনে করেন যে আওয়ামী লীগের প্রতি কথিত আনুগত্যের কারণেই এই সব সাংবাদিককে চাকুরীচ্যুত করা হয়। চাকুরীচ্যুত সাংবাদিকদের সহকর্মীরা কর্তৃপক্ষের এই পদক্ষেপের প্রতিবাদ করলে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি দেয়া হয়। বিএসএস ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ পরে ২২ জন সাংবাদিককে নিয়োগ দান করেন যারা বিএনপির প্রতি সহানুভূতিশীল বলে বলা হয়েছে।

২০শে মে মানবজমিন পত্রিকার সম্পাদক এবং ভয়েস অব আমেরিকার (ভিওএ) সংবাদদাতা মতিউর রহমান চৌধুরীকে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ এবং সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের একজন বিচারপতির মধ্যে কথোপকথনের একটি রেকর্ডকৃত বিবরণ প্রকাশের দায়ে ছয় মাসের কারাদন্ড প্রদান করা হয়। চৌধুরী এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেন এবং তার দন্ডাদেশ স্থগিত করা হয়েছে।

রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস 'আরএসএফ' প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী আলোচ্য বছরে ২৪৪ জন সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ২০০১ সালে নির্যাতিত সাংবাদিকদের সংখ্যা হচ্ছে ১৬২ এবং ২০০০ সালে নির্যাতিত সাংবাদিকদের সংখ্যা হচ্ছে ১২৬। তারা আরো জানায় যে আলোচ্য বছরে তিন জন সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে, ১শ' ২ জন আহত হয়েছে, ৩৯ জনকে আক্রমণ করা হয়েছে, ৩০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং ১৪৭ জনকে হুমকি দেয়া হয়েছে। ১৮ই জুন 'আরএসএফ' জানায় যে, বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের আট মাসের মধ্যে "১৪৫ জন সাংবাদিককে হয় মারধোর করা হয়েছে না হয় হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে, এক জনকে হত্যা করা হয়েছে, চার জনকে আটক করা হয়েছে, এবং দেশের ১৬টি প্রেস ক্লাবে অথবা সংবাদ কক্ষে হামলা করা হয়েছে।" 'আরএসএফ' কর্তৃক প্রদত্ত এই পরিসংখ্যান স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি এবং সরকার এই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছে।

২১শে জুন রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক এ.কিউ.এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর পদত্যাগের খবর সংগ্রহের জন্য তার বাসভবনে সমবেত হলে পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা সাংবাদিকদের লাঠি পেটা করে। কর্মকর্তারা মহিলা সাংবাদিকদের চুল ধরে টানাটানি করে এবং কয়েকজন ফটোসাংবাদিককে লাথি মারে। কর্মকর্তারা রাষ্ট্রপতির সাথে সাংবাদিকদের কথা বলতে দেয়নি। রাষ্ট্রপতির পুত্র বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য পুলিশকে বলেন যে তার পিতা সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে চান, তখন পুলিশ জানায় যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পুলিশকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছে তারা যেন পদত্যাগী রাষ্ট্রপতিকে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে না দেয়।

২রা জুলাই ঢাকার সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক যুগান্তরের মঙলা সংবাদদাতা মনিরুল হায়দার ইকবালকে সশস্ত্র বিএনপি কর্মীরা মারধোর করে। ক্ষমতাসীন কোয়ালিশনের সমর্থকবৃন্দ অবৈধভাবে চিংড়ি ঘের দখল করে আছে এই মর্মে সংবাদপত্রে প্রতিবেদন প্রকাশ করার কারণেই বিএনপি কর্মীরা তাকে মারধোর করেছে বলে ইকবালের দায়েরকৃত অভিযোগে জানা যায়। ইকবাল পুলিশের কাছেও একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেছে।

৫ই জুলাই বেআইনী ঘোষিত বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টির (বিসিপি) একটি অংশের সদস্যরা খুলনার দৈনিক অনির্বাণ-এর রিপোর্টার শুকুর আলীকে অপহরণ করে। শুকুর আলী নিখোঁজ রয়েছে এবং বিসিপি-এর পাঁচ জন সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে।

৫ই জুলাই সরকার নাটোর থেকে প্রকাশিত দৈনিক উত্তরবঙ্গ বার্তার প্রকাশনা লাইসেন্স বাতিল করে। ২৬শে মার্চ তারিখে দৈনিকটির একটি সংখ্যায় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে বিরোধী দলীয় নেতা এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উলেখ করে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার কারণে দৈনিকটির বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। পত্রিকাটির ব্যবস্থাপনা সম্পাদক এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগের একজন নেতা এই মর্মে ক্ষমা প্রার্থনা করেন যে, তথ্য প্রসেসিংয়ের সময় ত্রুটির ফলেই এটা ঘটেছে এবং পরদিন পত্রিকাটি একটি ভ্রম সংশোধনী প্রকাশ করে। সংবাদপত্রটির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, তারা সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করবেন।

১৩ই জুলাই সংসদের চিফ হুইপ খোন্দকার দেলওয়ার হোসেনের সন্তানের পরিচয়ে এক ব্যক্তি ঢাকার বাংলা দৈনিক প্রথম আলোর স্টাফ রিপোর্টার আরিফুর রহমানকে হত্যার হুমকি প্রদান করে। আরিফুর রহমান পুলিশের কাছে একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেছে।

২২শে জুলাই বাংলা দৈনিক জনকণ্ঠ সরকারের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ করে যে, সরকার দৈনিকটির প্রতিবেদন প্রকাশকে দমন করতে চাইছে। অভিযোগে বলা হয় ক্ষমতায় আসার অব্যবহিত পরেই সরকার জনকণ্ঠে বিজ্ঞাপন দেয়া বন্ধ করে দেয়। এর পরে পুলিশ বিভাগে বদলি সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য সরকার জনকণ্ঠের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা করার হুমকি প্রদান করে।

৭ই সেপ্টেম্বর একুশে টেলিভিশনের পক্ষে আয়োজিত একটি জনসভায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কর্মীরা হামলা করে বলে জানা যায়। ছাত্রদল কর্মীরা জনসভার মঞ্চ ভেঙ্গে তছনছ করে এবং সভার সংগঠকদের মারধোর করে। এই হামলায় ১০ জন আহত হয় এবং দু'জন গুরুতরভাবে আহত হয়। এদের মধ্যে একজন ছিলেন ঢাকার বাংলা দৈনিক প্রথম আলোর সংবাদদাতা এবং শেখ মুজিব সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর কর্মী। এই হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে বিএনপিপন্থী সাত জন ছাত্রকে দল থেকে বরখাস্ত করা হয়। ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ১১ই সেপ্টেম্বর ১০জন ব্যক্তিকে আগাম জামিন প্রদান করা হয়।

২৫শে নভেম্বর পুলিশ ব্রিটিশ টেলিভিশনের সাথে সংশিষ্ট দু'জন বিদেশী সাংবাদিককে আটক করে। এরা হলেন জেবা নাজ মালিক এবং লিওপোল্ড ব্রুনো সরেন্টিনো। বেনাপোল সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে যাবার সময় তাদেরকে আটক করা হয়। এই ঘটনার সাথে দু'জন বাংলাদেশী নাগরিক মনিজা প্রিসিলা রাজ ও মেসের আলীকেও গ্রেফতার করা হয়। মুখ্য মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে সাক্ষী হিসেবে জবানবন্দী দেওয়ার পর মেসের আলীকে মুক্তি প্রদান করা হয়। প্রিসিলা রাজের কাছ থেকে পুলিশ ভিডিও ক্যাসেট ও যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা বাজেয়াপ্ত করে এবং তাকে হাজতে পাঠানো হয়। এই তিনজন এবং ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক সেলিম সামাদকে দেশদ্রোহিতার দায়ে অভিযুক্ত করা হয় এবং আটককৃত তিনজনকে ২৬শে নভেম্বর পাঁচ দিনের পুলিশ রিম্যান্ডে পাঠানো হয়। সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকার সাংবাদিক সুমি খানকে এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে চট্টগ্রামে গ্রেফতার করা হয়। ১০ ঘন্টা আটক রাখার পর ২৯শে নভেম্বর সুমি খানকে মুক্তি দেয়া হয়। ১লা ডিসেম্বর এক প্রেস ব্রিফিংয়ে সরকারের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা খোন্দকার মনিরুল আলম বলেন যে, দুই বিদেশীকে এনজিও প্রতিনিধি হিসেবে "অন্তর্ঘাতমূলক" এবং "রাষ্ট্র বিরোধী কর্মকান্ড"-এর সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়েছে। দুই বিদেশী সাংবাদিককে ১১ই ডিসেম্বর বহিষ্কার করা হয়। তারা তাদের কর্মকান্ডের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বিবৃতি প্রদান করেন।

১৮ই ডিসেম্বর প্রিসিলা রাজকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করা হয়। তবে তাকে ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত জেলে থাকতে হয়। সামাদকে ২৩শে ডিসেম্বর জামিন মঞ্জুর করা হয় এবং তার মুক্তি সংক্রান্ত আদেশটি বিশেষ বাহক মারফত সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয় যাতে করে প্রিসিলা রাজের মুক্তির ক্ষেত্রে যে বিলম্ব ঘটে তার পুনরাবৃত্তি না হয়। তবে, সংশিষ্ট জেলে সামাদের মুক্তির আদেশ পৌঁছুবার পূর্বেই সামাদকে 'এসপিএ'-র আওতায় এক মাসের আটকাদেশ প্রদান করা হয়। ৩১শে ডিসেম্বর হাই কোর্ট সামাদের আটকাদেশের বৈধতার প্রশ্ন তুলে সরকারের ওপর রুল জারি করে।

৭ই ডিসেম্বর রয়টার্স সংবাদ সংস্থা একটি সংবাদ প্রচার করে। এতে বলা হয় যে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে, ময়মনসিংহ সিনেমা হলের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় ওসামা বিন লাদেনের আল-কায়েদা গোষ্ঠী জড়িত থাকতে পারে এবং তিনি এ কারণে জাতীয় পর্যায়ে একটি নিরাপত্তা অবস্থা জারী করেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই

বিবৃতি অস্বীকার করেন এবং রয়টার্স সংবাদটি প্রত্যাহার করে নেয়। ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে পুলিশ রয়টার্সের খন্ডকালীন সংবাদদাতা এনামুল হক চৌধুরীকে গ্রেফতার করে কারণ তিনিই সংবাদটি দিয়েছিলেন। রয়টার্সের ঢাকা অফিসেও পুলিশ তলাশী চালায়। বছরের শেষ পর্যন্ত এনামুল হক চৌধুরী জেলে ছিলেন।

রাজনৈতিক কর্মীরা প্রায়ই সাংবাদিকদের ওপর হামলা করে। ২০০১ সালের জানুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগ দলীয় এমপি জয়নাল হাজারীর সমর্থক রাজনৈতিক কর্মীরা ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ-এর (ইউএনবি) ফেনী সংবাদদাতা টিপু সুলতানকে মারধোর এবং ছুরিকাহত করে। আওয়ামী লীগের বিরোধীরা হামলার জন্য আওয়ামী লীগ পন্থী ছাত্র লীগ এবং আওয়ামী লীগ কর্মীদের দায়ী করে। আওয়ামী সরকার আহত টিপু সুলতানের চিকিৎসার জন্য ২০০০ ডলার সহায়তা প্রদান করে। টিপু সুলতান এই ঘটনার জন্য আইনের সহায়তা গ্রহণ করে তবে আজ পর্যন্ত এর কোন অগ্রগতি হয়নি। মামলাটি তদন্তের পর্যায়ে ছিল। দ্য কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্ট (সিপিজে) সরকারী পর্যায়ে দুর্নীতি ফাঁস করে দেয়ার জন্য টিপু সুলতানের প্রশংসা করে যে কারণে সুলতান হামলার শিকার হয়েছিলেন।

২০০১ সালের নভেম্বর মাসে সরকার জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক জনকণ্ঠে সরকারী বিজ্ঞাপন দেয়া বন্ধ করে দেয়। সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় এবং আওয়ামী লীগ কর্মীদের ওপর কথিত নির্যাতন সম্পর্কে জনকণ্ঠ কয়েকটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল।

নারীবাদী লেখিকা তসলিমা নাসরিন জামিনে মুক্তি লাভের পর বিদেশেই অবস্থান করছেন। দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত দেয়ার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী অভিযোগ এখনও মুলতুবী রয়েছে। ২৬শে মে তারিখে সরকার তার সর্বশেষ গ্রন্থ 'উতল হাওয়া' নিষিদ্ধ করেন। 'উতল হাওয়া' তার পূর্ববর্তী গ্রন্থ 'আমার মেয়েবেলা'রই (১৯৯৯) একটি ধারাবাহিকতা। 'আমার মেয়েবেলা' ইসলাম-বিরোধী অভিযোগে নিষিদ্ধ করা হয়। ১৩ই অক্টোবর একটি আদালত নাসরিনের অনুপস্থিতিতেই "ইসলাম সম্পর্কে অবমাননাকর" বক্তব্যের জন্য তাকে এক বছরের কারাদন্ড প্রদান করে। একজন স্থানীয় জামাত-ই-ইসলামী নেতা ১৯৯৯ সালে নাসরিনের বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করেন।

সরকারের ফিল্ম সেন্সর বোর্ড স্থানীয় ও বিদেশী ছায়াছবি পর্যালোচনা করে থাকে এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, আইন শৃঙ্খলা, ধর্মীয় অনুভূতি, অশালীনতা, বৈদেশিক সম্পর্ক, চরিত্র হনন, বা নকলের অভিযোগে যে কোন ছায়াছবি সেন্সর বা নিষিদ্ধ করতে পারে। আলোচ্য বছরে ফিল্ম সেন্সর বোর্ড স্থানীয়ভাবে নির্মিত কোন বাংলা চলচ্চিত্র নিষিদ্ধ করেনি। তবে এপ্রিল মাসে ফিল্ম সেন্সর বোর্ড সাধারণ্যে প্রদর্শনের জন্য ছাড়পত্র দেয়ার উদ্দেশ্যে নির্মাতার অনুরোধে একটি চলচ্চিত্রের সংলাপ সংশোধন করার অনুমোদন দেয়। ১৪ই ডিসেম্বর হাইকোর্ট হাসন রাজার (একজন আধ্যাত্মিক দার্শনিক যিনি শত শত গান রচনা করেছিলেন) বংশধর সাদিয়া চৌধুরী পরাগের আবেদনক্রমে "হাসন রাজা" চলচ্চিত্রের প্রদর্শন স্থগিত করে। আবেদনে পরাগ জানায় যে সংশিষ্ট চলচ্চিত্রে বর্ণিত ঘটনার সাথে সত্যের কোন মিল নেই। এতে প্রকৃত ঘটনা বিকৃত করে হাসন রাজার স্মৃতির ওপর কলঙ্ক আরোপ করা হয়েছে। আদালত ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের ওপর চলচ্চিত্রটি কেন দেখানো হবে তার ব্যাখার নোটিশ প্রদান করে। অশালীনতার কারণে সেন্সর বোর্ড বেশ কয়েকটি আমদানিকৃত ইংরেজী চলচ্চিত্রের প্রদর্শন নিষিদ্ধ করে। ভিডিও লাইব্রেরীগুলো বিভিন্ন ধরনের ফিল্ম তাদের সদস্যদের ভাড়া দিয়ে থাকে আর এদের ক্ষেত্রে সরকারী সেন্সর আরোপের চেষ্টা মাঝে মাঝে হয়ে থাকে তবে তা ফলপ্রসূ হয় না। সরকার বাংলাদেশী নাগরিকদের ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন রকম বাধা সৃষ্টি করে না।

বিদেশী প্রকাশনা পর্যালোচনা ও সেন্সরশীপের আওতাধীন। অশালীন আলোকচিত্র, ইসলাম ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা বা অবমাননাকর কোন কিছু লেখা থাকলে অথবা জাতীয় নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে কোন আপত্তিকর মন্তব্য থাকলে সেন্সরশীপ আরোপ করা হয়।

সরকার "ফার ইস্টার্ণ ইকনমিক রিভিউ" পত্রিকার ৪ঠা এপ্রিল সংখ্যা নিষিদ্ধ করে। কারণ এই পত্রিকায় দেশের ইসলামপন্থী আন্দোলন সম্পর্কে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছিল। বাংলাদেশে ট্যুরিস্ট ভিসায় প্রবেশরত বিদেশী সাংবাদিকদের ওপর কঠোর নজরদারি করার জন্য নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়।

সরকার শিক্ষাঙ্গনের স্বাধীনতার প্রতি সাধারণভাবে শ্রদ্ধাশীল। সকল স্তরে ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ অবাধে তাদের জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারে। তবে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়ে গবেষণা নিষিদ্ধ।

সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলোর পরিস্থিতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভের এবং শিক্ষকদের শিক্ষাদানের ক্ষমতা গুরুতরভাবে ব্যাহত করছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্র গ্রুপ অথবা কোন একটি দলের ছাত্র গ্রুপগুলোর নিজেদের মধ্যে অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রগ্রুপগুলোর মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের কারণে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট এবং নোয়াখালিতে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কলেজসমূহ দীর্ঘদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

খ. শান্তিপুর্ণ সভা সমাবেশ করা ও সংগঠন করার স্বাধীনতা

সংবিধানে জনশৃঙ্খলা ও জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে বিধিনিষেধ সাপেক্ষে সভা সমাবেশ করার স্বাধীনতা রয়েছে। অবশ্যি, সরকার প্রায়ই এই অধিকার সীমিত করে। ফৌজদারী আইনের ১৪৪ ধারার আওতায় সরকার চার জনের অধিক ব্যক্তির একত্রে সমাবেশ নিষিদ্ধ করতে পারে। একটি মানবাধিকার সংগঠনের ভাষ্য অনুযায়ী আলোচ্য বছরের প্রথম ছয় মাসে সরকার ২৪ বার এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। সরকার কখনো কখনো নিরাপত্তার কারণে নিষেধাজ্ঞা জারি করে সভাসমাবেশ নিষিদ্ধ করে। কিন্তু অনেক স্বাধীন পর্যবেক্ষক এই সব ব্যাখ্যাকে অজুহাত বলে মনে করেন। ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকরা প্রায়ই একই স্থানে এবং একই সময়ে তাদের সভার আয়োজন করে থাকে যেখানে বিরোধী দলের সভার সময় আগে থেকেই নির্ধারণ করা থাকে। এর ফলে সরকার সরকার নিরাপত্তার কারণে নিষেধাজ্ঞা জারির একটা সুযোগ পেয়ে যায়।

৯ই জানুয়ারী ঢাকায় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে একটি শান্তিপুর্ণ অবস্থান ধর্মঘটে সশস্ত্র পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ধর্মঘটীরা জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ করছিল। পুলিশ শোভাযাত্রাকারীদের বিরুদ্ধে লাঠি চার্জ করে। পুলিশ আওয়ামী লীগ কর্মীদের মিছিল করতে দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে আওয়ামী কর্মীরা অবস্থান ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত নেয়। ঐ দিনই বিকালে মুক্তাঙ্গনে পুলিশ আওয়ামী লীগের একটি সমাবেশের বিরুদ্ধে একই ধরণের পদক্ষেপ নেয় এবং ১০ জন আওয়ামী লীগ কর্মীকে তুলে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগ নেতারা পুলিশের সাথে কথা বললে পুলিশ জানায় তারা তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করছে।

২৫শে মার্চ আওয়ামী লীগের একটি পুর্ব নির্ধারিত অনশন ধর্মঘট বানচাল করার উদ্দেশ্যে ঢাকা মহানগরী পুলিশ ওসমানী উদ্যান এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। এই অনশন কর্মসুচীর উদ্দেশ্য ছিল সরকারী

অফিস থেকে মরহুম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি অপসারণ করা সম্পর্কিত আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। আওয়ামী সমর্থকবৃন্দ শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা হিসেবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকেন। নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও সমর্থকরা যখন ওসমানী উদ্যানে সমবেত হতে থাকেন, তখন পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং তাদের ওপর লাঠি চার্জ করে। পুলিশ তাদেরকে মারধোরও করে। পুলিশ যাদেরকে মারধোর করে তাদের মধ্যে ছিলেন ভূতপূর্ব কৃষি মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর রাজনৈতিক সচিব সাবের হোসেন চৌধুরী এবং বিশিষ্ট টেলিভিশন অভিনেতা ও রাজনীতিবিদ এবং সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান নুর। এদেরকে প্রায় তিন ঘন্টা আটক রাখা হয়।

বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র শাখাগুলোর মধ্যে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে বিভিন্ন উপদলের মধ্যে সহিংসতা একটি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

১৫ই জানুয়ারি ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন সম্পর্কিত সরকারের একটি ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। পুলিশের সাথে সংঘর্ষে কিছু সংখ্যক শিক্ষকসহ প্রায় ১শ' ছাত্র আহত হয়।

২৭শে আগস্ট প্রগতিশীল ছাত্র ঐক্য (পিএসইউ) আহুত দেশব্যাপী একটি ছাত্র ধর্মঘট চলাকালে বুয়েট ক্যাম্পাসে ১২ জন ছাত্র পুলিশী পদক্ষেপের ফলে আহত হয়। এর ফলে প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়টি অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

বিএনপিপন্থী ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের কেন্দ্রীয় কমিটি বাতিল করার পর ২০০১ সালের শেষ দিকে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে একটি ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার জন্য সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানান। আওয়ামী লীগ এবং কিছু ছাত্র ও শিক্ষক এই উদ্যোগের বিরোধিতা করেন। ৯ই সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন এবং একটি নতুন কমিটি গঠনের ঘোষণা দেন।

আলোচ্য বছর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অনেক বার হরতাল আহ্বান করে। রাজনৈতিক দলের কর্মীরা সহিংসতার হুমকি অথবা হরতালভঙ্গকারীদের প্রতি প্রকৃত সহিংসতার মাধ্যমে এসব হরতাল কার্যকর করে। যারা হরতালে যোগ দেয়নি তাদেরকে বলপূর্বক তাদের যানবাহন এবং বাণিজ্যিক কর্মকান্ড বন্ধ রাখতে বাধ্য করা হয়। রাজনৈতিক দলের কর্মীরা হরতালের সময় মিছিল করে। জরিপে যদিও দেখা গেছে অধিকাংশ নাগরিক রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে হরতাল ব্যবহারের বিরোধী, তবুও সকল বড় বড় রাজনৈতিক দল হরতাল অব্যাহত রাখে। ২০০১ সালের আগস্ট মাসে সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ হরতাল আহ্বান করা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে সম্মত হন, তবে আলোচ্য বছর হরতাল থেকে বিরত থাকার কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি। হরতালের সময় পুলিশ ক্ষমতাসীন দলের মিছিলে কদাচিৎ বাধা প্রদান করে এবং তারা বিরোধী দলের মিছিল নিরুৎসাহিত করতে এবং সেগুলো পন্ড করতে প্রায়ই ক্ষমতাসীন দলের কর্মীদের সাথে একসাথে কাজ করেছে।

সংবিধানে নৈতিকতা বা জনশৃঙ্খলার স্বার্থে "যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে" প্রতিটি নাগরিকের সমিতি গঠনের অধিকার দেয়া হয়েছে। সাধারণভাবে সরকার এই অধিকার মান্য করে। ব্যক্তি বিশেষ যে কোন বেসরকারী গ্রুপে যোগ দিতে পারে।

গ. ধর্মীয় স্বাধীনতা

সংবিধানে ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার সাপেক্ষে ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা অনুযায়ী ধর্ম পালনের অধিকার রয়েছে। সরকার কার্যত এই অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যদিও সরকার ধর্মনিরপেক্ষ তবুও রাজনীতিতে ধর্মের অত্যন্ত শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে। সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর চিন্তাচেতনার প্রতি সংবেদনশীল। কোন অপরাধ করে শাস্তি না পাওয়ার পরিবেশ বিদ্যমান থাকার ফলে সরকার সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীগুলোকে রক্ষায় ব্যর্থ হতে পারে। জনসংখ্যার ৮৮ শতাংশ মুসলমান। হিন্দু, খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কিছু সংখ্যক মনে করেন এবং প্রত্যক্ষ করেন যে যারা সংখ্যালঘুদেরকে রাজনৈতিকভাবে দুর্বল বিবেচনা করে তারা সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমুলক আচরণ করে।

সরকারী চাকুরী এবং রাজনৈতিক পদলাভের ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা কার্যত কোন সুবিধা ভোগ করতে পারে না। সরকারী চাকুরীর সিলেকশন বোর্ডগুলোতে প্রায়ই সংখ্যালঘুদের কোন প্রতিনিধিত্ব থাকে না।

ধর্মীয় সংগঠনগুলোকে সরকারের কাছে নাম রেজিষ্ট্রি করতে হয় না। সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বিদেশ থেকে অর্থ গ্রহণ করলে সকল এনজিও এবং ধর্মীয় সংগঠনকে সরকারের এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কাছে তাদের নাম রেজিস্ট্রি করতে হয়। কোন এনজিও-এর রেজিস্ট্রেশন বাতিল, তার নির্বাহী কমিটি বিলুপ্ত করা, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আটক করা অথবা কোন প্রকল্প বাতিলসহ তার বিরুদ্ধে অন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার আইনগত ক্ষমতা সরকারের রয়েছে। এই ক্ষমতা অবশ্যি কদাচিৎ ব্যবহার করা হয় এবং ধর্মীয় সংশিষ্টতা রয়েছে এমন এনজিওগুলো সরকারের এই ক্ষমতার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

সরকার অন্যান্য বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরকে তাদের উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা, তাদের যাজকদের প্রশিক্ষণ দান, ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ভ্রমণ, এবং বিদেশে সমধর্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অনুমতি দেয়। আইনের আওতায় নাগরিকদের ধর্মান্তরকরণের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু ইসলাম থেকে ধর্মান্তরকরণের ব্যাপারে জোর সামাজিক বিরোধিতা থাকায় অধিকাংশ খ্রীষ্টান মিশনারিদের লক্ষ্য হচ্ছে কয়েক প্রজন্ম ধরে যারা খ্রীষ্ট ধর্ম পালন করছে তাদের মাঝে তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখা। বিদেশী মিশনারিরা দেশে কাজ করতে পারেন, তবে তাদের ধর্মান্তরকরণের অধিকার সংবিধানে সংরক্ষিত নয়। কিছু মিশনারী ভিসা পেতে অথবা ভিসার নবায়ন করতে অসুবিধার সম্মুখীন হয় যা অবশ্যই বাৎসরিকভাবে নবায়ন করতে হয়। তবে কোন মিশনারীই আলোচ্য বছরে অন্য কোন ধরণের হয়রানীর কথা উলেখ করেনি।

২০০১ সালের জানুয়ারি মাসে হাইকোর্ট সকল ধরনের ফতোয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইসলামী আইনে যাদের বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা রয়েছে কেবল সেই সকল মুফতিরাই (ধর্মীয় পন্ডিত) ফতোয়া ঘোষণা করতে পারেন। তবে প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রামের ধর্মীয় নেতারা কোন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ফতোয়া জারি করে থাকে। সাধারণতঃ, বিয়ে ও তালাকের ব্যাপারে ফতোয়া দেয়া হয়, অথবা কারো নৈতিক সীমারেখা লংঘনের বিষয়ে অবহিত হবার পর শাস্তিস্বরূপ কারো বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করা হয়ে থাকে। যাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করা হয় তাদেরকে চাবুক মারা হয়ে থাকে অথবা তাদের সমাজ তাদের পরিত্যাগ বা একঘরে করে (অনুচ্ছেদ ১.গ দ্রষ্টব্য)। যদিও হাইকোর্টের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা বিচার-বহির্ভূত শাস্তি বা দন্ড প্রয়োগের অবসান ঘটানো, কিন্তু হাইকোর্ট প্রদত্ত জানুয়ারির রুলিং-এ সব ধরনের ফতোয়াকেই অবৈধ ঘোষণা

করা হয় (অনুচ্ছেদ ১.ক দ্রষ্টব্য)। এর কয়েক সপ্তাহ পর আপীল আদালত হাই কোর্টের রুলিং স্থগিত রাখে। এই বিষয়ে পুনরায় শুনানির কোন তারিখ নির্ধারণ করা হয়নি।

আইন প্রয়োগের বৈষম্যের কারণে, বিশেষ করে 'শত্রু সম্পত্তি আইনে'র জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের বহু লোক তাদের হারানো সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সম্পত্তির মালিকানা, বিশেষ করে হিন্দুদের মধ্যে, সেই ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকেই একটি বিতর্কিত বিষয় হয়ে রয়েছে। ২০০১ সালের ৯ই এপ্রিল তারিখে সংসদে "শত্রু সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বিল ২০০১" পাশ হয়। বর্তমানে বিলুপ্ত 'শত্রু সম্পত্তি আইনে'র অধীনে যে সকল সম্পত্তি দখল/আটক করা হয়েছিল "শত্রু সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বিল ২০০১" পাশের ফলে সরকারকে সেটা ফিরিয়ে দিতে হবে। এই আইনের অধীনে রাষ্ট্রকে "শত্রু"র (এক্ষেত্রে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন) সম্পত্তি দখল করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। ২০০১ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে সরকারকে অর্পিত সম্পত্তির একটি তালিকা প্রকাশ করতে বলা হয়। তালিকা প্রণয়নের ৯০ দিনের মধ্যে দাবিনামা পেশ করতে হবে। এই সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে গেলে আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না। সরকার এখনও অর্পিত সম্পত্তির কোন তালিকা প্রকাশ করেনি।

২৬শে নভেম্বর সংসদ অর্পিত সম্পত্তি আইনের একটি সংশোধনী পাশ করে যার আওতায় অর্পিত সম্পত্তি প্রতর্পনের ক্ষেত্রে সরকারকে অসীম সময় প্রদান করা হয়। যতদিন না একটি ট্রাইব্যুনাল এগুলোর মালিকানার নিষ্পত্তি করবে ততদিন এই সম্পত্তি ডেপুটি কমিশনারদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে । সংশোধনীর আওতায় মালিকদের কাছে সম্পত্তিগুলো ফিরিয়ে না দেয়া পর্যন্ত সেগুলোকে লিজ দেয়ার ক্ষমতা ডেপুটি কমিশনারদের প্রদান করা হয়েছে। সরকার দাবি করছে এই ব্যবস্থার ফলে সম্পত্তিগুলোকে চুরি হওয়া অথবা বেহাত হওয়া থেকে বিরত রাখবে।

২০০১ সালের নির্বাচনের পর থেকে কিছু সংবাদপত্র, এনজিও, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান পরিষদ এবং আওয়ামী লীগ অভিযোগ করেছে যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়েছে। সরকার মাঝে মধ্যে স্থানীয় হামলাকারীদের বিচার, তদন্ত, এবং সমালোচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে। অবশ্যি একমাত্র ধর্মীয় পার্থক্যের কারণেই সুনির্দিষ্ট হামলার ঘটনাগুলো স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি।

২০০১ সালের অক্টোবরের নির্বাচনের আগে এবং পরে হত্যা এবং আহত হওয়াসহ বিভিন্ন সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। হত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ, এবং নির্যাতনসহ হিন্দুদের ওপর নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে।

২০০১ সালের নভেম্বর মাসে হাইকোর্ট ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার বিষয়টি খতিয়ে দেখে হাইকোর্টকে অবহিত করার এবং সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার জন্য যে সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে তা প্রমাণ করার জন্য আদালত সরকারকে আদেশ প্রদান করে। সরকার বছরের শেষ ভাগে তার রিপোর্ট পেশ করে।

একটি মানবাধিকার সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী কেয়ারটেকার সরকার থেকে নবনির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্যবর্তী সময়ে বিএনপি সমর্থকরা ভোলা জেলায় কমপক্ষে ১০ জন হিন্দু মহিলাকে ধর্ষণ করে এবং কয়েকজন হিন্দু নাগরিকের বাড়িঘর লুট করে। দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলীয় বাগেরহাট জেলা থেকেও ধর্ষণ ও লুটতরাজের খবর পাওয়া যায়। নতুন সরকারের সদস্যবৃন্দ সংশিষ্ট উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন করে সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করলে পরিস্থিতির উন্নতি হয়। ফেব্রুয়ারী মাসে আওয়ামী লীগ সমর্থিত একটি

"মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ" শীর্ষক কনভেনশনে "সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত নির্যাতনের" অভিযোগ করা হয় এবং এই অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক আইনে বিচারের দাবি জানানো হয়।

কয়েকটি ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর কথিত নির্যাতন সম্পর্কে স্বাধীন মানবাধিকার সংগঠনের তদন্তে দেখা গেছে যে, কিছু কিছু সংবাদপত্র সাধারণ অপরাধমূলক ঘটনাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা হিসেবে প্রকাশ করেছে। ৪ঠা জুন দৈনিক জনকণ্ঠের একটি প্রতিবেদনে বলা হয় যে জামাত-ই-ইসলামীর সমর্থকবৃন্দ ৬০ বছর বয়সী একজন হিন্দু মহিলার কাপড় খুলে নিয়ে তার একটি নগ্ন ফটো তুলেছে। বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির একটি তদন্তকারী দল এই ঘটনা তদন্ত করে এবং পত্রিকার রিপোর্টের সপক্ষে কোন প্রমাণ পায়নি।

অতীতে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের মুসলিমরা হামলা ও হয়রানির শিকার হয়। আহমদীয়া সম্প্রদায়ের অনুসারীদেরকে মূলধারার মুসলিমরা বিধর্মী হিসেবে বিবেচনা করে। ১৯৯৯ সালে মূলধারার মুসলিম কর্তৃক কুষ্টিয়ায় দখলিকৃত একটি আহমদীয়া মসজিদ তিন বছর পুলিশের নিয়ন্ত্রণে থাকে ফলে আহমদীয়ারা তাদের প্রার্থনা করতে পারেনি। আগস্ট মাসে আহমদীয়া সম্প্রদায় মসজিদটির নিয়ন্ত্রণভার পুনরায় লাভ করে এবং তাদের প্রার্থনা শুরু করে।

২২শে এপ্রিল তারিখে চট্টগ্রাম জেলার রাউজানে একটি বৌদ্ধ মন্দিরের ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি মহাস্থবিরকে অজ্ঞাত পরিচয় বন্দুকধারীরা হত্যা করে। সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে এই আভাস পাওয়া যায় যে, জমি সংক্রান্ত বিরোধের কারণে এই হত্যাকান্ড সংঘঠিত হয়ে থাকতে পারে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোরশেদ খান মন্দির পরিদর্শন করেন এবং জনগণকে এই আশ্বাস দেন যে, এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত হবে এবং হত্যার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিচার হবে। ২২শে ডিসেম্বর তারিখে পুলিশ আলিছ মোহাম্মদ ওরফে মাহমুদকে এই মামলায় গ্রেফতার করে। আলোচ্য বছরের শেষ ভাগ পর্যন্ত মামলাটির তদন্ত অব্যাহত ছিল।

২৮শে এপ্রিল খাগড়াছড়ির রাধা মাধব আশ্রমে এক দল দুষ্কৃতকারী মদন গোপাল নামে একজন হিন্দু পুরোহিতকে হত্যা করে। দুষ্কৃতকারীরা মন্দির থেকে সোনার মূর্তিগুলো লুট করে নিয়ে যায়।

আলোচ্য বছরের ১২ই মে ১২ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি বেলতলীর দাবুয়া বেনুবন বিহার বৌদ্ধ মন্দিরে দরজা ভেঙ্গে প্রবেশ করে। পরে মন্দিরের লোকজন ও স্থানীয় অধিবাসীরা তাদেরকে তাড়া করে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। এ ব্যাপারে আইন ও শালিস কেন্দ্র হাইকোর্টে একটি আবেদন করে। হাইকোর্ট সরকারকে বিষয়টি তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেয়। সরকার আগস্ট মাসে আদালতে তার রিপোর্ট পেশ করে বলে যে, যেখানেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের প্রতি সহিংস ঘটনা ঘটেছে, সেখানেই ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদেরকে সরকার শাস্তি দিয়েছে। সরকারের রিপোর্টে বলা হয় যে, অনেকগুলো ঘটনার বিবরণই হয় মিথ্যা নতুবা অতিরঞ্জিত।

২০০১ সালের জুন মাসে গোপালগঞ্জ জেলার বানিয়াচরে একটি ক্যাথলিক চার্চের অভ্যন্তরে রবিবারের প্রার্থনা সভায় একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। এই বিস্ফোরণে ১০ জন নিহত এবং ২০ জন আহত হয়। সেনাবাহিনী ঘটনার তদন্ত করে বলে যে বিস্ফোরিত বোমাটি দেশের বাইরে তৈরী। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিকে আটক করে, তবে বছরের শেষে এই মামলায় কোন অগ্রগতি হয়নি। ২০০১ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকার একটি বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করে যার উদ্দেশ্য হল আওয়ামী লীগ আমলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাসমূহ এবং বানিয়াচরের ঘটনা তদন্ত করা।

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে কমিশন সরকারের কাছে তার রিপোর্ট পেশ করে। কমিশন আওয়ামী লীগ আমলের শেষ ভাগে সাতটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটনার ছয়টির জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা এবং তার দলের কয়েকজন সহকর্মীকে দোষারোপ করে। কমিশনের তিন জন সদস্যের মধ্যে দুই জন বলেন তারা এই সব বোমা বিস্ফোরণ ঘটনা তদন্ত করে কোন দোষী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করতে পারেননি এবং তারা কমিশনের প্রতিবেদনের সাথে দ্বিমত প্রকাশ করেন। তারা এ কথাও বলেন যে, কমিশনের প্রধান বিচারপতি আব্দুল বারী সরকার চূড়ান্ত প্রতিবেদনে তার ব্যক্তিগত অভিমত প্রবিষ্ট করেছেন।

২০০১ সালের নভেম্বর মাসে চট্টগ্রামের নাজিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরা হত্যা করে। এই ঘটনার পরে হিন্দু সমাজের লোকজন প্রচন্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা বলে যে, হিন্দু বলেই মুহুরীকে হত্যা করা হয়েছে। মুহুরীর পরিবারের লোকজন জানায় যে, মুহুরী জামাত-ই-ইসলাম ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন না কারণ তিনি জামাত ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের কলেজে প্রবেশ করতে দেননি। এটা স্পষ্ট নয় এই হত্যাকান্ডের পেছনে কোন ধর্মীয় কারণ ছিল কিনা। হত্যাকান্ডের সংগে জড়িত থাকার অভিযোগে কলেজের তিন জন শিক্ষককে পুলিশ গ্রেফতার করে। এদের পরপর জামিন দেয়া হয়েছে। জুলাইতে পুলিশ এই হত্যাকান্ডের সংগে জড়িত থাকার সন্দেহে তিন জন পরিচিত অপরাধীকে গ্রেফতার করে। এই তিন জনের সকলেই জেলে ছিল। ১৪ই নভেম্বর পুলিশ হত্যাকান্ডের সংগে জড়িত থাকার দায়ে তিন জন কলেজ শিক্ষক, জেলে আটক তিন জন এবং কলেজের একজন হিসাব রক্ষকসহ ১২ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে। মুহুরী ঐ কলেজেরই প্রিন্সিপাল ছিলেন।

এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত তথ্যের জন্য ২০০২ সালের 'আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিবেদন' দ্রষ্টব্য।

ঘ. দেশের অভ্যন্তরে চলাচলের, বিদেশ ভ্রমণের, এবং অভিবাসনের ও প্রত্যাবাসনের অধিকার

সংবিধানে নির্বাসনের ব্যাপারে কোন কিছু বলা হয়নি। তবে, দেশের অভ্যন্তরে অবাধ চলাচলের অধিকার, বিদেশে ভ্রমণ, অভিবাসন এবং প্রত্যাবাসনের অধিকার সংবিধান প্রদান করেছে। সাধারণতঃ নাগরিকরা দেশের অভ্যন্তরে অবাধে চলাচল করতে পারে, বিদেশে যেতে পারে বা অভিবাসন করতে পারে এবং প্রত্যাবাসিত হতে পারে। তবে কিছু কিছু ঘটনা রয়েছে যেখানে সরকার এই সব অধিকার সীমিত করেছে।

ডিসেম্বর মাসের দুই তারিখে হাইকোর্ট সাবেক পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মহিউদ্দীন খান আলমগীরের পাসপোর্ট ফিরিয়ে দেয়ার আদেশ দেয় যাতে তিনি শারীরিক অসুস্থতাহেতু চিকিৎসার কারণে তিন মাসের জন্য বিদেশে যেতে পারেন। তিনি যখন সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করছিলেন সে সময় জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তার পাসপোর্ট আটক করা হয় (অনুচ্ছেদ ১.ঘ দ্রষ্টব্য)।

মাঝে মধ্যেই প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের চলাচলে বাধা প্রদান করা হয়েছে, এবং তাদেরকে সাহায্য করার জন্য সরকার খুব কমই এগিয়ে এসেছে।

আগস্ট মাসের ৩০ তারিখে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার একটি মোটরবহরকে বাধা প্রদানের জন্য বিএনপি কর্মীরা দেশের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলীয় সাতক্ষীরা জেলায় একটি সড়কে ব্যারিকেড দেয়। বিএনপি

কর্মীরা তার গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়ে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। হাসিনার দেহরক্ষীরা আন্দোলনকারীদের পরাভূত করে এবং তার মোটরবহর নির্বিঘ্নে সেই এলাকা অতিক্রম করে। এই লড়াইয়ে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ আনেন আওয়ামী লীগ নেতারা এবং ঘটনার প্রতিবাদে ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করে তারা (অনুচ্ছেদ ১.ঘ দ্রষ্টব্য)।

চলতি বছরে ইসরায়েলে ভ্রমণের জন্য বাংলাদেশী পাসপোর্ট বৈধ ছিল না।

আনুমানিক ৩০০,০০০ বিহারী মুসলিম সারা দেশের বিভিন্ন শিবিরে বসবাস করছে। পাকিস্তানে প্রত্যাবাসনের আশায় তারা ১৯৭১ সাল থেকে এ দেশে রয়েছে। এরা সবাই অবাঙ্গালী মুসলমান, যারা ১৯৪৭ সালে বৃটিশ ভারতের বিভক্তির পর সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে অভিবাসী হয়ে আসে। এদের অধিকাংশ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানকে সমর্থন করে। তারা পরে এ দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় এবং পাকিস্তানে প্রত্যাবাসনের দাবি জানায়। পাকিস্তান সরকার ঐতিহাসিকভাবে বিহারীদের গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক।

১৯৯২ সালের পরে আনুমানিক ২৩২,০০০ রোহিঙ্গা (বার্মার উত্তরাঞ্চলীয় আরাকান প্রদেশের মুসলমান) স্বেচ্ছায় বার্মায় ফিরে গেছে। আরো অতিরিক্ত ২২,৭০০ শরণার্থী শিবির ত্যাগ করেছে এবং স্থানীয় বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর সাথে বসবাস করছে। জাতিসংঘ উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশনার (ইউএনএইচসিআর)-এর সহযোগিতায় সরকার পরিচালিত দু'টি শিবিরে ২০,৮০০-এর অধিক শরণার্থী বসবাস করছে। ১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাসে "ইউএনএইচসিআর" সরকারকে এই মর্মে অনুরোধ করে যে, যে সব শরণার্থী ফিরে যেতে পারছে না তাদেরকে এদেশে কাজ করতে দেয়া হোক, তারা স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচীর সুবিধা লাভ করুক এবং তাদের সন্তানদেরকে স্থানীয় স্কুলে যেতে দেয়া হোক। সরকার এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে এবং জোর দিয়ে বলে যে, বার্মায় ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত সকল রোহিঙ্গা শরণার্থীকে শিবিরের মধ্যেই থাকতে হবে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর ভাষ্য অনুযায়ী রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরের কর্মকর্তারা শিবিরে বসবাসকারীদের ওপর সহিংসতা চালিয়েছে। রোহিঙ্গাদের প্রতি স্থানীয় জনগণও বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

এপ্রিলের ২৪ তারিখে শরণার্থী, পুলিশ এবং ছাত্র কর্মীদের মধ্যে এক সংঘর্ষে ১০ জন রোহিঙ্গাসহ প্রায় ৭০ জন আহত হয়। কুতুপালং শরণার্থী শিবিরে একটি নতুন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের সময় একজন ঠিকাদারের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের জন্য বিএনপি-র ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা এসে হাজির হলে এই সংঘর্ষের উদ্ভব ঘটে।

বার্মা সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সদস্যদের সাথে আলোচনা সত্ত্বেও দুই সরকার প্রত্যাবাসনের হার ত্বরান্বিত করতে পারেনি।

"ইউএনএইচসিআর", সরকার এবং মানবাধিকার গ্রুপগুলোর ভাষ্য অনুযায়ী, ১৯৯১ সাল থেকে যে ১০০,০০০ (এক লক্ষ) -এর অধিক রোহিঙ্গা এ দেশে প্রবেশ করেছে, তারা কোন রকম আনুষ্ঠানিক দলিলপত্র ও নিবন্ধীকরণ ছাড়া শিবিরগুলোর বাইরে অত্যন্ত করুণ অবস্থার মধ্যে বসবাস করছে। নতুন যারা এসেছিল সরকার তাদেরকে প্রথমে আশ্রয় প্রত্যাখ্যান করে এবং তাদেরকে অবৈধ অর্থনৈতিক অভিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করে। সরকার যথাসম্ভব তাদেরকে সীমান্তে ফিরিয়ে দেয়। "ইউএনএইচসিআর"-এর মতে তারা যাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিল, তাদের কিছু সংখ্যক বার্মা সরকারের অত্যাচার নিপীড়নের ভয়ে পালিয়ে এসেছে বলে জানিয়েছিল এবং তারা শরণার্থীর মর্যাদা লাভের যোগ্য ছিল। শরণার্থী শিবিরগুলোতে বিদেশী

কূটনীতিকদের সফরের পর প্রকাশ পায় যে নিবন্ধন করেনি এমন কিছু শরণার্থী, যাদের অনেকেই বার্মাতে সরকারী প্রত্যাবাসনের পর অবৈধভাবে ফেরত এসেছিল, তারা শিবিরগুলোতে বাস করছে এবং তাদের সেই সকল আত্মীয়স্বজনের সাথে খাবার ভাগ করে নিচ্ছে যারা শিবিরের নিবন্ধীকৃত সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে খাবারের রেশন লাভ করে। বেশ কয়েকবার শিবির কর্মকর্তারা এ ধরনের অনিবন্ধনকৃত ব্যক্তিদের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে এবং পুলিশ 'বিদেশী আইনের' আওতায় তাদেরকে জেলে প্রেরণ করেছে।

শরণার্থীদের মর্যাদার সঙ্গে সংশিষ্ট ১৯৫১ সালের জাতিসংঘ সনদ এবং ১৯৬৭ সালের প্রটোকলের আলোকে শরণার্থী বা আশ্রিতের মর্যাদা দেয়ার বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত নয়। সরকার শরণার্থীদের সহায়তার ব্যাপারে জাতিসংঘ শরণার্থী হাই কমিশন (ইউএনএইচসিআর) ও অন্যান্য মানবিক সংগঠনের সাথে সাধারণভাবে সহযোগিতা করে থাকে। আইনে প্রথমে আশ্রয় প্রার্থনা অথবা আশ্রয়প্রার্থীদের বসবাসের সুযোগ নেই। "ইউএনএইচসিআর" সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে যাদের শরণার্থী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, তাদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার সাময়িক আশ্রয়ের ব্যাপারে অনুমোদন দিয়েছিল। "ইউএনএইচসিআর"-এর অনুরোধে সরকার আনুমানিক ১২৫ জন শরণার্থী ও আশ্রয়প্রার্থীকে অন্য কোন দেশে বসবাসের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত বা তাদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত অথবা স্বেচ্ছামূলক প্রত্যাবাসন না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থান করার অনুমতি দিয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে রোহিঙ্গা নয় বার্মার এমন নাগরিক, সোমালিয়া, ইরান এবং শ্রীলঙ্কার নাগরিক। আলোচ্য বছরে সরকার একজন ভারতীয় এবং চারজন বর্মীর আশ্রয় প্রার্থনার আবেদন প্রত্যাখ্যান করে যারা ফেব্রুয়ারি মাসে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিল (অনুচ্ছেদ ১.ঘ দ্রষ্টব্য)।

অনুচ্ছেদ ৩ রাজনৈতিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ: সরকার পরিবর্তনের নাগরিক অধিকার

বাংলাদেশ একটি বহুদলীয় ও সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির দেশ যেখানে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কমপক্ষে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সংসদের সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত হয়ে থাকেন। সংসদে ৩০০ জন নির্বাচিত সদস্য রয়েছেন। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রার্থী নিয়োগ করে থাকেন। অনেকেই অভিযোগ করে থাকে যে কিছুসংখ্যক প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারণার জন্য প্রচুর পরিমাণে চাঁদা দিয়ে বা ব্যক্তিগতভাবে "উপহার" প্রদান করে পার্টি নেতাদের কাছ থেকে মনোনয়ন "ক্রয়" করে থাকে।

১৯৯৬ সালের একটি শাসনতান্ত্রিক সংশোধনীর আওতায় সংসদীয় সাধারণ নির্বাচন একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। সুপ্রিম কোর্টের সর্বসাম্প্রতিক সময়ে অবসরপ্রাপ্ত একজন প্রধান বিচারপতি এই সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন, অথবা তিনি যদি কোন কারণে না পারেন বা অনিচ্ছুক থাকেন তবে অন্য একজন সিনিয়র অবসরপ্রাপ্ত বিচারক বা একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। ২০০১ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগ দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সংবিধান অনুযায়ী সে সময় একজন প্রধান বিচারপতি অধিষ্ঠিত হন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে যার দায়িত্ব ছিল জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান করা এবং ২০০১ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা গ্রহণ না করা পর্যন্তসরকারের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করা। কিছু বিচ্ছিন্ন সহিংসতা এবং বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও ১লা অক্টোবর, ২০০১-এ অনুষ্ঠিত অষ্টম সাধারণ নির্বাচনটিকে দেশী ও আন্তর্জাতিক

পর্যবেক্ষকবৃন্দ সাধারণভাবে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হিসেবে অভিহিত করেছেন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ওই নির্বাচনকে "ব্যাপক জালিয়াতি" বলে অভিযোগ করেন। তবে, শেষ পর্যন্ত তিনি সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং সংসদে বিরোধী দলের প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হন।

তিনশত আসন বিশিষ্ট সংসদে আওয়ামী লীগ লাভ করে ৫৮টি সদস্যপদ। ক্ষমতাসীন দলের কর্মীদের দ্বারা দেশের বিভিন্ন স্থানে দলের সদস্যদের হয়রানি ও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার অভিযোগ এনে ২০০১-এর অক্টোবর মাস থেকে আলোচ্য বছরের ২৪শে জুন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সংসদ বয়কট করে।

২০০১-এর অক্টোবর নির্বাচনের আগে এবং পরে নিহত ও আহত হবার ঘটনাসহ ব্যাপক সহিংসতা ঘটে। সেপ্টেম্বর মাসে নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর সময়ে আওয়ামী লীগের একজন কর্মী নিহত হয়। একই মাসে বাগেরহাট জেলায় এক নির্বাচনী সমাবেশে দু'টি বোমা বিস্ফোরিত হলে আওয়ামী লীগের কমপক্ষে ৮ জন কর্মী নিহত ও ১শ'রও বেশি সদস্য আহত হয়। ক্রমবর্ধমান সহিংসতার কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৫০ হাজার সেনা মোতায়েন করে। নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় হত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ এবং নির্যাতনসহ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদেরকে নানাভাবে হয়রানি করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে (অনুচ্ছেদ ১.ক এবং ২.গ দ্রষ্টব্য)।

২০০০ সালের জুলাই মাসে জাতীয় সংসদ জেলা পরিষদ আইন পাশ করে। এই আইনের আওতায় নিম্ন পর্যায়ের নির্বাচিত প্রধিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচকমন্ডলীর দ্বারা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অপ্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হওয়ার বিধান করা হয়েছিল। এই আইনের আওতায় ঐসব অপ্রত্যক্ষ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত সরকারকে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নিয়োগ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। সরকার অবশ্যি এই সব চেয়ারম্যান নিয়োগ করেননি।

রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতির পরিবর্তন করে সংসদীয় পদ্ধতির প্রবর্তন করার জন্য ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করা হয়। এই সব পরিবর্তনের আওতায় আরো রয়েছে যে একজন সংসদ সদস্য যদি তার দল থেকে পদত্যাগ করেন অথবা সংসদে তার দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তাহলে তিনি সরাসরি তার সংসদীয় আসন হারাবেন। প্রকৃতপক্ষে এই বিধান সংসদের ওপর সরকার ও প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণকে আরো সুসংহত করেছিল। বাস্তবিকপক্ষে সংসদের সামান্য অথবা কোনরকম সংশিষ্টতা ছাড়াই প্রধানমন্ত্রী নিজেই গুরুত্বপূর্ণ সরকারী নীতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। তুলনামূলকভাবে দেশের সংকীর্ণ ও দলীয় রাজনীতির কারণে পরামর্শ সভা হিসেবে সংসদের কার্যকারিতা আরো বেশী ক্ষুণ্ন হয়েছে। আশু সুবিধা লাভের আশায় রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে থাকে এবং এসব কর্মকান্ড কেন্দ্রীভূত থাকে নির্দিষ্ট কয়েকজন রাজনীতিকের মধ্যে। বিরোধী দলে থাকার সময় সকল প্রধান বিরোধী দলই সংসদ অধিবেশন বর্জন করে এসেছে। দলগুলো দাবি করে থাকে যে আইন প্রণয়ন ও গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যু নিয়ে বিতর্কে সংশিষ্ট হবার তাদের খুব কমই সুযোগ রয়েছে। ২০০১ সালের আগস্ট মাসে সকল প্রধান রাজনৈতিক দল সম্মত হয় যে তারা সংসদ বর্জন করবে না; তবে আওয়ামী লীগ বর্তমান সংসদের প্রথম তিনটি অধিবেশন এবং চতুর্থ অধিবেশনের আংশিক বর্জন করে।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটিগুলোর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এমপিগণ, সংশিষ্ট মন্ত্রীরা নন। এর ফলে তারা কার্যকরভাবে সরকারী কাজকর্ম তদারক করতে পারেন। তবে, ৩৭ জন মন্ত্রী/বিভাগের স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোসহ বেশির ভাগ সংসদীয় কমিটিই আলোচ্য বছরে গঠিত হয়নি। আওয়ামী লীগ দাবি করেছিল যে গঠিত ৪৮টি কমিটির মধ্যে ক্ষমতাসীন দল কমপক্ষে ১০টির সভাপতি পদে বিরোধী

দলের সদস্যদের নিয়োগ প্রদান করুক। সপ্তম সংসদের ৪৬টি কমিটির মধ্যে মাত্র একটি কমিটির সভাপতি ছিলেন একজন বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্য।

২০০১ সালের আগস্ট মাসের ৮ তারিখে তত্ত্বাবধায়ক সরকার 'জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সংশোধনী' (রিপ্রেজেন্টেশন অব দি পিপল অ্যামেন্ডমেন্ট) নামে একটি অধ্যাদেশ পাশ করে। এতে বহু-প্রয়োজনীয় নির্বাচনী সংস্কারের বিষয়সমূহ মোকাবেলা করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই অধ্যাদেশ নির্বাচন কমিশনকে আরো কাজ করার স্বাধীনতা দিয়েছে এবং নির্বাচনের দিনে সামরিক বাহিনীর নির্দিষ্ট শাখাকে আইন প্রয়োগ করার ক্ষমতা দিয়েছে। নতুন আইনের অধীনে রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের নির্বাচনী চাঁদা এবং নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যয়িত অর্থের রেকর্ড রাখতে হবে এবং সঠিক হিসাব থাকতে হবে। এই অধ্যাদেশে নির্বাচনী এলাকাগুলোতে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় ধরনের পর্যবেক্ষকদের জন্য অনুমতি সঙ্কলিত করা হয়েছে। পূর্ববর্তী নির্বাচনগুলোর সময়ে ভোটগ্রহণকারী বুথগুলোতে যদিও সীমিত সংখ্যক পর্যবেক্ষক উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু সে সময় তাদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার মতো কোন আইনগত বিধিমালা ছিল না। সিভিল সোসাইটি সংগঠনগুলোসহ স্থানীয় এনজিও'রা অক্টোবর, ২০০১-এর নির্বাচনের সময়ে ব্যাপক সংখ্যক পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছিল। নির্বাচনের সময় জাল ভোট দেয়া বা ভোট জাল করার ঘটনার বিচার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য একটি অনুবিধিও জারি করা হয়েছে এই অর্ডিন্যান্সে। ২০০১-এর অক্টোবরের নির্বাচনকালে ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের সময়ে দায়ের করা ২২টি ভোট চুরির মামলার মধ্যে ২১টিই তখনো অমীমাংসিত অবস্থায় ছিল। নতুন আইনের আওতায় জাল ভোটের ঘটনা এখন নিম্ন আদালতের বদলে সরাসরি হাই কোর্টে বিচার করা হয়। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে কমিশনকে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদানের জন্য আরো সংস্কারের প্রস্তাব করে নির্বাচন কমিশন আলোচ্য বছরে একটি খসড়া প্রস্তাব নিয়ে কাজ করছিল। তবে এ ব্যাপারে তেমন উলেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়নি।

আলোচ্য বছরের জানুয়ারি মাসে চারটি নির্বাচনী এলাকায় শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে সংসদীয় উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে ভোটার উপস্থিতির হার স্বাভাবিকের চেয়ে কম ছিল। ২৫শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত ঢাকা, খুলনা ও ও রাজশাহীর পৌর নির্বাচনও আওয়ামী লীগ বর্জন করে।

২০০১ সালের এপ্রিল মাসে মহিলাদের সংসদে অংশগ্রহণের সাংবিধানিক বিধান মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। এর আগে পর্যন্ত সংসদে মহিলাদের জন্য ত্রিশটি আসন সংরক্ষিত ছিল। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে এসব আসনে তাদের মনোনীত হবার প্রথা ছিল; তবে সমালোচকদের অভিযোগ ছিল যে, এসব আসন ক্ষমতাসীন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যতখানি পুষ্ট করতো মহিলাদের ক্ষমতায়নে ততখানি অবদান রাখতো না। সংরক্ষিত আসনগুলো ছাড়াও মহিলারা সংসদের যে কোন আসনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন ও পারেন এবং সংসদে বিদ্যমান ৩০০ আসন বজায় রেখে মহিলাদের জন্য কমপক্ষে আরো ৬০টি আসন যোগ করতে ২০০১-এর আগস্ট মাসে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি উভয় দলই নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছিল। তবে এই নির্বাচনী বিধান চালু করার জন্য বিএনপি বা আওয়ামী লীগ কেউই আলোচ্য বছরে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

উপজাতীয় জনগোষ্ঠীসহ অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্যে কোন নির্দিষ্ট আসন সংরক্ষিত নেই। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যরা নির্বাচনে আসন লাভ করে। তবে, সংখ্যালঘুদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নেই। দেশের মোট জনসংখ্যার আনুমানিক ১২ শতাংশ সংখ্যালঘু এবং তারা সংসদীয় আসনের শতকরা তিন ভাগেরও কম আসন লাভ করেছে।

অনুচ্ছেদ ৪ মানবাধিকার লংঘনের কথিত অভিযোগ তদন্তের কাজে আন্তর্জাতিক ও বেসরকারী সংগঠনগুলোর প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি

সরকার সাধারণভাবে মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যাবার অনুমতি প্রদান করে থাকে। সুনির্দিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন সংগঠন তাদের প্রতিবেদন প্রকাশ করে, সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করে এবং নির্দিষ্ট কিছু ঘটনার ক্ষেত্রে সরকারের কাছে আবেদন করে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো প্রায়ই সরকারের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করলেও সংগঠনগুলো নিজেরাই রাজনৈতিকভাবে নাজুক মামলা ও বিষয়সমূহে স্ব-আরোপিত সেন্সরশীপ মেনে চলে। আলোচ্য বছরে নারী ও শিশু অধিকার গ্রুপগুলোর সাথে আলোচনা করে জন্ম নিবন্ধনকরণ আইন চূড়ান্ত করার জন্য সরকার ইউনিসেফ-কে অনুরোধ করে। ২০০০ সালের জানুয়ারি মাসে সংসদে 'নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইন' পাশ হয়।

জুন মাসে বাংলাদেশ সরকার সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট-এর আওতায় অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বাংলাদেশ শাখাকে রেজিস্ট্রেশনের অনুমতি প্রদান করে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রথমবার আবেদন করে ১৯৯০ সালে। এই রেজিস্ট্রেশন ছাড়া কোন এনজিও বিদেশ থেকে অর্থ সাহায্য পেতে পারে না।

মানবাধিকার সমস্যা বিষয়ে আন্তর্জাতিক সমালোচনা মোকাবিলায় সরকারের আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা বজায় ছিল। তবে চলতি বছরে এ ধরনের সমস্যা নিয়ে আন্তর্জাতিক সংগঠন ও বিদেশী কূটনৈতিক মিশনগুলোর সাথে সংলাপের ব্যাপারে সরকার খোলা মনের পরিচয় দিয়েছে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি এবং বহু বার জনসমক্ষে ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার একটি স্বায়ত্বশাসিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত খসড়া আইন অনুমোদন করতে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পূববর্তী সরকারও বার বার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও একটি মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়। এছাড়া একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠনের জন্য নির্বাচনকালে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও তা বাস্তবায়নের জন্য বর্তমান সরকার দৃশ্যত তেমন কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

'অফিশিয়াল সিক্রেট্স অ্যাক্ট'-এর পরিবর্তে 'রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট' প্রণয়নের জন্য সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা পূরণের জন্যও সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এপ্রিল মাসে আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমেদ বলেন যে পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে সংসদে 'রাইট টু ইনফরমেশন' বিল উত্থাপন করা হবে। কিন্তু বছরের শেষ নাগাদ এ ধরনের কোন বিল সংসদে আসেনি। বছরের শুরুতে সরকার বহু দশকের পুরনো ন্যায়পাল আইন ('ওমবুড্সম্যান ল') কার্যকর করার উদ্যোগ নেয় এবং আইনমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে শীঘ্র একজন ন্যায়পাল নিয়োগ করা হবে। তবে বছরের শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে আর কিছু শোনা যায়নি।

সরকার কয়েকজন মানবাধিকার প্রবক্তা ব্যক্তি বিশেষের উপর চাপ প্রয়োগ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়েরের মতো ঘটনা অথবা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কর্মীদের জন্য 'রিএন্ট্রি' ভিসা প্রদানে দীর্ঘ বিলম্ব। যেসব মিশনারি মানবাধিকারের সপক্ষে কাজ করেন, তারাও অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। কয়েকজন মানবাধিকার কর্মী জানিয়েছেন যে তারা গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে হয়রানির শিকার হয়েছেন।

সেপ্টেম্বর মাস থেকে শুরু করে বছরের শেষ পর্যন্ত সরকার দেশের অভ্যন্তরে এনজিও কার্যক্রমের ওপর একটি নীতি প্রতিবেদন খসড়া করে। এই নীতির মুল লক্ষ্য হচ্ছে এনজিওগুলোর রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা। এই রিপোর্টের আসন্ন প্রকাশের ব্যাপারে বেশ কয়েকবার বিবৃতি দেয়া সত্ত্বেও বছরের শেষ পর্যন্ত এই নীতির খসড়া চূড়ান্তকরণ সম্পন্ন হয়নি।

অনুচ্ছেদ ৫ জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম, শারীরিক অক্ষমতা, ভাষা অথবা সামাজিক মর্যাদার কারণে বৈষম্য

বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে, "আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান এবং সকল নাগরিক আইনের সমান সুরক্ষা পাবার অধিকারী।" বাস্তবিকপক্ষে, বৈষম্য নির্মূলের উদ্দেশ্যে সংশিষ্ট আইনগুলো সরকার দৃঢ়ভাবে বলবৎ করে না। নারী, শিশু, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং প্রতিবন্ধীরা প্রায়ই সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে থাকে।

নারী

সাম্প্রতিক বিভিন্ন রিপোর্টসমূহ এই ইঙ্গিত দেয় যে গৃহাভ্যন্তরীণ সহিংসতা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। তবে, অনির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের কারণে মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সহিংস ঘটনার সংখ্যা নিরূপণ করা দুরূহ ছিল। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয় যে, দেশের ৪৭ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা তাদের পুরুষ সঙ্গীর কাছে শারীরিকভাবে প্রহৃত হয়েছে বলে জানিয়েছে। সরকার, সংবাদমাধ্যম এবং নারী অধিকার সংগঠনগুলোর তৎপরতা নারীর প্রতি সহিংসতা সম্পর্কে সচেতনতা ক্রমশঃ জোরদার করেছে। নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার বেশিরভাগই যৌতুক সংক্রান্ত বিরোধিতার সাথে সম্পর্কিত। একটি মানবাধিকার গ্রুপের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০০২ সালে ১শ' ৯০ জন মহিলা যৌতুকের কারণে নিহত হয়েছে। এই সকল হত্যাকান্ড ছাড়াও আলোচ্য বছরে আরো ২৮ জন মহিলা আত্মহত্যা করেছে, একজন আত্মহত্যার চেষ্ট চালিয়েছে, ৯০ জন শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে, ১৪ জন মহিলা এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে, কমপক্ষে একজন মহিলাকে তার স্বামী তালাক দিয়েছে এবং ২ জন মহিলাকে তাদের স্বামী যৌতুকজনিত বিরোধের কারণে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

মে মাসের ১৪ তারিখে যশোরে একজন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল জজ এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করে। যৌতুকের কারণে ওই ব্যক্তি ১৯৯৭ সালে তার স্ত্রী কোহিনূরকে পিটিয়ে হত্যা করেছিল।

জুলাই মাসের এক তারিখে কে. এম. রশিদ জুয়েল নামে এক ব্যক্তি তার স্ত্রী নূরজাহান আখতার বকুলকে পিটিয়ে হত্যা করে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এর কারণ, বকুলের পরিবারের পক্ষ থেকে জুয়েলের দাবি অনুযায়ী যৌতুক প্রদানের ব্যর্থতা। গুরুতরভাবে আহত বকুলকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেবার পর সে সেখানে মারা যায়।

জুলাই মাসের দুই তারিখে কিশোরগঞ্জের একটি জেলা আদালত মতিউর রহমান নামে এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করে। স্ত্রী হোসনে আরার পরিবারের যৌতুক প্রদানে ব্যর্থতার কারণে সে তার স্ত্রীকে ১৯৯৪ সালের জুন মাসে পিটিয়ে হত্যা করে।

২০০১ সালের মে মাসে হাইকোর্ট তিনজন পুলিশের মৃত্যুদন্ড নিশ্চিত করে। ১৯৯৫ সালে একটি ১৪ বছরের মেয়েকে ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে তাদেরকে অভিযুক্ত করা হয়।

আইন অনুযায়ী ধর্ষণ ও স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর ওপর দৈহিক নির্যাতন নিষিদ্ধ। তবে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে ধর্ষণ অপরাধ হিসেবে গণ্য করার কোন সুনির্দিষ্ট বিধান নেই। একটি মানবাধিকার সংগঠনের মতে, ২০০২ সালে মোট এক হাজার ৩শ' ৫০ জন নারী ও মেয়েশিশু ধর্ষিত হয়। ধর্ষণকারীদের বিচারে তেমন সামঞ্জস্য থাকে না। কিছু ধর্ষণ মামলায় দেখা যায় ধর্ষণকারীর যাবজ্জীবন (বাস্তবিকপক্ষে সাড়ে ২২ বছর) সাজা হয়েছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে গ্রাম্য সালিশী পরিষদের মাধ্যমেই মামলার নিষ্পত্তি হতে দেখা যায়। তবে এসব পরিষদের অপরাধী ব্যক্তিদের বিচার করার ক্ষমতা নেই, আর তাই তারা শুধুমাত্র একটি জরিমানা ধার্য করতে পারে। বহু ধর্ষণের ঘটনার কোন রিপোর্ট করা হয় না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধর্ষণের শিকার মেয়েরা সামাজিক কলঙ্কসহ ধর্ষণ পরবর্তী মানসিক নির্যাতনের যন্ত্রণা এড়াতে আত্মহত্যা করে। একটি এনজিও-র রিপোর্ট অনুযায়ী আলোচ্য বছরের প্রথম ছয় মাসে ধর্ষণের শিকার হয়েছে এমন ১৫ জন আত্মহত্যা করেছে।

একটি নারী অধিকার সংগঠনের ভাষ্য অনুযায়ী মধ্য আগস্ট পর্যন্ত আদালতগুলো ১৮ জন ধর্ষণকারীকে মৃত্যুদন্ড এবং ৬১জন ধর্ষণকারীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করে।

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, গ্রাম্য সালিশকারীরা ধর্ষণকারীকে শাস্তি প্রদানসহ অথবা শাস্তি প্রদান ছাড়াও ধর্ষণের যে শিকার হয় তাকেও শাস্তি প্রদান করে থাকে। আলোচ্য বছরের ২৬শে ফেব্রুয়ারি রাজশাহীর কাছে মিয়াপাড়াতে ইউনিয়ন পরিষদের একজন সদস্য একজন আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণ করে। গ্রামের নেতারা পরে ধর্ষণের শিকার মহিলাকে চাবুক মারে এবং তাকে ১৫শ' টাকা জরিমানা করে।

মহিলাদের বিরুদ্ধে কয়েক ধরনের বৈষম্য নিষিদ্ধ করে সরকার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করেছিল। এই সব আইনের মধ্যে ছিল, যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন, নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা বিরোধী আইন, এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইন (অনুচ্ছেদ ১.ঘ দ্রষ্টব্য)। তবে এসব আইনের প্রয়োগ ছিল অত্যন্ত দুর্বল, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এবং সরকার কালেভদ্রে দায়ের করা মামলাগুলোর বিচার করে। সরকারী সূত্রগুলোর মতে, দুস্থদের জন্য সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ছয়টি ভবঘুরে আশ্রয় কেন্দ্র এবং একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করে, এই কেন্দ্রগুলোর মোট লোক ধারণ ক্ষমতা দুই হাজার তিনশ'। আলোচ্য বছরের জুলাই মাসে এই আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে ১ হাজার ৯শ' ৮৬ ব্যক্তি ছিল, এদের মধ্যে ১ হাজার ৭৫ জন ছিল মহিলা। এছাড়াও, নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের জন্য নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশের ছয়টি সদর দপ্তরে একটি করে মোট ছয়টি আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালনা করে। সরকার-পরিচালিত ৭টি এবং বেসরকারীভাবে পরিচালিত ১৩টি রয়েছে। মহিলাদের জন্য কিছু ক্ষুদ্র আশ্রয় কেন্দ্রও রয়েছে।

আলোচ্য বছরের মে মাসের ২০ তারিখে মন্ত্রণালয় ঢাকায় একটি নিরাপদ হেফাজত কেন্দ্র চালু করে। বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী পরিষদ (বিএনডবুএলএ)-এরও ঢাকায় দু'টি আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে এবং দুস্থ ব্যক্তি ও দুর্দশাগ্রস্ত মহিলা ও শিশুদের আশ্রয় দেয়ার জন্য আরো কয়েকটি এনজিও-ও এধরনের আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালনা করে থাকে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় এগুলো মোটেই পর্যাপ্ত নয়। এর ফলে, যে সব মহিলা ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করে, সরকার তাদেরকে প্রায়শঃই "নিরাপদ হেফাজতের" নামে কারাগারে আটক করে রেখেছে। নিরাপদ হেফাজতে অবস্থানকারী মহিলাদের আরো সহিংস ঘটনার শিকার হতে দেখা গেছে। এ কারণে অন্য মহিলারা অনুরূপ অভিযোগ দায়ের করতে নিরুৎসাহিত বোধ করেছে। অধিকাংশ

ক্ষেত্রে দৈহিকভাবে নির্যাতিতা মহিলাদের দীর্ঘকাল যাবৎ নিরাপত্তা হেফাজতে রেখে দেয়া হয় এবং এ থেকে মুক্তি পাওয়া তাদের জন্যে দুরূহ হয়ে ওঠে (অনুচ্ছেদ ১.গ দ্রষ্টব্য)।

মানবাধিকার সংগঠন এবং সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে এই আভাস পাওয়া যায় যে, গ্রাম্য সালিশের মাধ্যমে মহিলাদের বিচার-বহির্ভূত শাস্তি প্রদানের ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে পল্লী-এলাকায় মাঝে মধ্যে বিচার বিভাগ বহির্ভূত গ্রাম্য সালিশের মাধ্যমে মহিলাদের শাস্তি দেয়ার ঘটনা একটি সাধারণ ব্যাপার। এ সব ঘটনার মধ্যে রয়েছে নৈতিক অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত মহিলাদের শাস্তি প্রদান, যেমন বেত্রাঘাত করা (অনুচ্ছেদ ২.গ দ্রষ্টব্য)।

এসিড হামলা ক্রমশঃই একটি উদ্বেগজনক বিষয় হয়ে উঠেছে। হামলাকারীরা বহু সংখ্যক মহিলার মুখে এসিড ছুঁড়ে মেরেছে এবং এর শিকার পুরুষের সংখ্যাও আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসিড নিক্ষেপের শিকারদের মুখাবয়ব বিকৃত হয়ে গিয়েছে এবং বেশির ভাগ সময় দেখা গেছে তারা দৃষ্টিশক্তিও হারিয়েছে। 'এসিড সারভাইভার্স ফাউন্ডেশন' প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর আনুমানিক ৩শ'টির মতো এসিড হামলার ঘটনা ঘটে থাকে। স্থানীয় এই বেসরকারী সংগঠনটি এসিড হামলার শিকারদের সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। এসিড হামলার শিকারদের মধ্যে অর্ধেকেরই বেশি মহিলা। বিগত তিন বছরে এসিড হামলার শিকার পুরুষের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ব্যাপকভাবে চিকিৎসার পরও এসিড নিক্ষেপের শিকারদের চেহারা মারাত্মকভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে থাকে, সমাজের সাথে পুনরায় মিশে যাওয়াটা তাদের জন্য খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। এসিড নিক্ষেপের প্রধান কারণ সাধারণতঃ প্রণয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মহিলার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ। জমিজমা নিয়ে বিরোধ এসিড হামলার আরেকটি প্রধান কারণ। এসিড হামলাকারীদের মধ্যে খুব কমসংখ্যক ব্যক্তিরই বিচার হয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হামলাকারী রাতের বেলা খোলা জানালা দিয়ে এসিড ছুঁড়ে থাকে, ফলে প্রকৃত হামলাকারীকে সনাক্ত করা দুরূহ হয়ে পড়ে।

একটি মানবাধিকার সংগঠনের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী আলোচ্য বছরে ৪শ' ৮৩ ব্যক্তি এসিড হামলার শিকার হয়েছে। এদের মধ্যে ২শ' ৪৭ জন মহিলা এবং ১শ' ৩৬ জন ছিল পুরুষ। বছরের প্রথম আট মাসে 'বিএন ডবুএলএ' ২৬টি এসিড সন্ত্রাস সংক্রান্ত অপরাধের বিচার কাজ এগিয়ে নেয়। এর মধ্যে মীমাংসিত হয় তিনটি ঘটনা। এগুলোর মধ্যে একটিতে অপরাধীকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়, আরো তিনজন অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়ে জেলে প্রেরণ করা হয়। ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০১ পর্যন্ত রিপোর্ট করা ৭শ' ৫০টি এসিড হামলার মধ্যে এ পর্যন্ত ২৫ জন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী প্রমাণ করা গেছে। এই ২৫ অপরাধীর মধ্যে নয়জনকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়েছে। হামলার শিকারের ক্ষতের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হয়ে থাকে।

মার্চ মাসে সরকার এসিডের সহজপ্রাপ্যতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে এবং মহিলাদের প্রতি এসিড সন্ত্রাসের ভয়াবহতা মোকাবেলার জন্য দু'টি আইন পাশ করে। তবে জনগণ ও আইন প্রয়োগকারী কর্মীদের মধ্যে এই আইনের ব্যাপারে কোন প্রকার সচেতনতার অভাবে এবং এর অতি স্বল্প প্রয়োগের কারণে এই এসিড অপরাধ নিয়ন্ত্রণ আইন প্রাথমিকভাবে কোন প্রকার প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়। ২০০১ সালে ৩শ' ৫১ ব্যক্তি, যাদের বেশির ভাগই মহিলা, এসিড হামলার শিকার হয় এবং এর মধ্যে ১শ' ৫৩টি মামলা দায়ের করা হয়। তবে, এই নতুন এসিড অপরাধ নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নের ফলে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল ব্যবস্থায় দ্রুততর

বিচার কাজ সম্ভব হবে আইনের অধীনে দায়েরকৃত মামলায় অভিযুক্ত অপরাধীদের জামিন অনুমোদন করা হবে না।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক হারে নারী পাচার অব্যাহত ছিল। এছাড়া আরো বিশ্বাসযোগ্য রিপোর্ট পাওয়া গেছে যে এই সব পাচারকার্যে পুলিশ সহায়তা করেছে অথবা তারা সরাসরি সংশিষ্ট ছিল (অনুচ্ছেদ ৬.চ দ্রষ্টব্য)।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজে মহিলাদের স্থান গৌণ। সরকার তাদের মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে তেমন কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। মহিলাদের মধ্যে সাক্ষরতার হার আনুমানিক ২৯ শতাংশ, তুলনায় পুরুষদের মধ্যে তা শতকরা ৫২ ভাগ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিদ্যালয়ে মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। মোটামুটিভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে পড়ুয়াদের মধ্যে ৫০ শতাংশ মেয়ে। নিরক্ষরতার উচ্চ হার, এবং শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্যের কারণে মহিলারা বেশির ভাগ সময়েই তাদের অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। এ ছাড়া সামাজিকভাবে কলংকিত হবার ভীতি এবং আদালতের আশ্রয় নিয়ে আইনগত সহায়তা লাভের জন্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি না থাকার কারণে মহিলারা প্রায়শঃই আদালতে প্রতিকার প্রার্থনা থেকে বিরত থাকে। মহিলাদেরকে তাদের নিজস্ব অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং এই অধিকার প্রয়োগে তাদের উৎসাহ প্রদান ও সাহায্য করার লক্ষ্যে বহুসংখ্যক বেসরকারী সংগঠন কাজ করে চলেছে। মেয়েদের শিক্ষার জন্য সরকারও তার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে শিক্ষা কর্মসূচী সম্প্রসারণ করেছে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা চালু করে সরকার দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের (আনুমানিক ১৮ বছর বয়স) জন্য শিক্ষা ফ্রি করেছে সরকার। সেই তুলনায় ছেলেদের জন্য শিক্ষা ফ্রি করা হয়েছে পঞ্চম শেণী পর্যন্ত। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া পয়লা আগস্টে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি প্রদান কর্মসূচী উদ্বোধন করেন এবং তিনি আরো ইঙ্গিত প্রদান করেন যে এই কর্মসূচী উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হতে পারে।

মুসলিম পারিবারিক অর্ডিন্যান্সের আওতায় পুরুষের তুলনায় মহিলারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির ভাগ কম পেয়ে থাকে। তালাক দেয়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের অধিকার সীমিত। পুরুষেরা একসাথে চারজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে, যদিও তারা এই অধিকার খুব কমই প্রয়োগ করে থাকে। বিবাহিতা মহিলাকে একতরফা তালাক প্রদান এবং প্রথম স্ত্রীর সম্মতি ব্যতিরেকে স্বামী কর্তৃক পুনরায় বিবাহের বিরুদ্ধে আইনে মহিলাদের কিছু সুরক্ষা হয়েছে। তবে এই সব সুরক্ষার ব্যবস্থা শুধুমাত্র নিবন্ধীকৃত (রেজিস্টার্ড) বিবাহের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে পল্লী-এলাকায় অধিকাংশ বিয়েরই কোন নিবন্ধন হয় না। আইনে মুসলিম স্বামীকে তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তিন মাসের খোরপোষ প্রদান করতে হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রেই নির্ধারিত সময়ের জন্য তা প্রদান করা হয় না এবং কোন কোন সময় তা একবারেই দেওয়া হয় না।

বিগত দশকে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের চাকুরীর অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি হয়। এর কারণ হচ্ছে ঢাকা ও চট্টগ্রামে রপ্তানীমুখী পোশাক শিল্পের বিকাশ। পোশাক শিল্পে কর্মরত ১৪ লাখ কর্মীর আনুমানিক ৮০ শতাংশই ছিল মহিলা। পল্লী-অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক মহিলাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচী সম্প্রসারণ তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। অবশ্য উপার্জনকারী অন্যান্য চাকুরীতে মহিলাদের সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য। ২০০০ সালের অক্টোবর মাসে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী মাত্র ১২ শতাংশ সরকারী চাকুরীতে মহিলারা কর্মরত ছিল। উর্ধ্বতন পদে মহিলাদের সংখ্যা ছিল ২ শতাংশ মাত্র। সরকারী চাকুরীতে অধিক সংখ্যক মহিলা কর্মী নিয়োগ-সংক্রান্ত সরকারী নীতির ফলাফল সীমিত। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে

আনুমানিক ১৫ শতাংশ। ২০০১-এর মে মাসে প্রকাশিত এক সরকারী জরিপের ফলাফলে দেখা গিয়েছিল দেশের পুলিশ এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মীবাহিনীর মধ্যে মাত্র ২.১ শতাংশ নারী। অন্যদিকে স্থানীয় সরকার ও পল্লী-উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ে মহিলা কর্মচারীর হার ছিল মাত্র ১.৭৭ ভাগ।

আলোচ্য বছরে পোশাক ও চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মহিলা শ্রমিকদের কাজ করার সুযোগ লাভ করেছে। তেতালিশ শতাংশ মহিলা কৃষি, মৎস্যচাষ ও গবাদিপশু পালনখাতে নিয়োজিত ছিল, তবে এদের মধ্যে আবার ৭০ শতাংশ মহিলা পারিবারিক ক্ষেত্রে বিনা পারিশ্রমিকে কর্মরত ছিল। বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্পেও অনেক মহিলা কায়িক শ্রমিক হিসেবে কর্মরত রয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী নির্মাণ কাজেও শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত রয়েছে প্রায় ২৫ শতাংশ মহিলা। ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, কোমল পানীয় এবং হস্তশিল্প কারখানাতেও মহিলাদের কর্মরত দেখা গেছে। এই সকল ক্ষেত্রে একই ধরনের কাজে মহিলারা পুরুষদের অনুরূপ বেতন পেয়ে থাকে।

শিশু

সরকার প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। সরকারী উদ্যোগের সমর্থনে অনেক স্থানীয় ও বিদেশী এনজিও সম্পুরক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এই সমস্ত যৌথ উদ্যোগের ফলে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষার উন্নয়নে এই দেশ তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জনে সমর্থ হয়েছে। তবে, অর্ধেকেরও বেশি শিশু দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টির শিকার।

এ দেশের সবচাইতে বড় এনজিও ব্র্যাক (বাংলাদেশ রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি) ১২ লক্ষেরও অধিক শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করে থাকে। সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতর এবং কিছু সহযোগী এনজিও'র সহায়তায় ইউনিসেফ দেশের বিভিন্ন শহরের বস্তি এলাকাগুলোতে বসবাসরত সাড়ে তিন লক্ষ (৩৫০,০০০) শিশুকে শিক্ষা প্রদানের একটি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে। এই শিশুরা কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

এছাড়া, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) পঞ্চাশ হাজারেরও (৫০,০০০) বেশি শিশুর জন্য শিক্ষা ও সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। ১৯৯১ সালে সরকার ছয় থেকে দশ বছরের শিশুদের জন্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। তবে এই আইন এখনো পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়নি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ছয় থেকে দশ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে ৮০ শতাংশেরও কিছু বেশি শিশু স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ছেলেশিশু ও মেয়েশিশুদের স্কুলে ভর্তি হবার হার মোটামুটিভাবে সমান ছিল। মোট শিশুদের মধ্যে আনুমানিক ৭০ শতাংশ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া শেষ করেছে। অধিকাংশ স্কুলেই দুই শিফটে ক্লাশ হয়ে থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নরত অধিকাংশ শিশুই দিনে মাত্র আড়াই ঘন্টা শ্রেণী কক্ষে অবস্থান করে; আর তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত শিশুরা শ্রেণী কক্ষে অবস্থান করে চার ঘন্টা। পল্লী-অঞ্চলের ১২ থেকে ১৬ বছর বয়সী মেয়েদেরকে স্কুলে যাওয়ার জন্যে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। স্কুলগামী মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত এই সব ব্যবস্থাদি ফলপ্রসূ হয়েছে।

ব্যাপক দারিদ্র্যের কারণে অনেক শিশুই অত্যন্ত কম বয়সে কাজ শুরু করতে বাধ্য হয়। এর ফলে প্রায়ই শিশুদের ওপর নির্যাতন হয়। বাসাবাড়ির কাজে নিয়োজিত শিশুদের সাথে তাদের চাকুরীদাতারা দুর্ব্যবহার করে। বাসাবাড়িতে যারা কাজ করে অনেক সময় সেই শিশু কাজের মেয়েদেরকে প্রায় ক্রীতদাসের মতো এবং পতিতার মতও ব্যবহার করা হয় (অনুচ্ছেদ ৬.গ এবং ৬.ঘ দ্রষ্টব্য)। শ্রম সম্পর্কিত এই শিশু নির্যাতন সাধারণভাবে সমাজের সকল স্তরে এবং সারাদেশেই ঘটে থাকে। আলোচ্য বছরে মাঝে মাঝে কর্মস্থলে শিশুদের মারাত্মকভাবে আহত বা নিহত হবার ঘটনা ঘটেছে (অনুচ্ছেদ ৬.ঘ দ্রষ্টব্য)। মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের রিপোর্টে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, শিশুদের ত্যাগ করা, অপহরণ এবং শিশু পাচার একটি ব্যাপক ও গুরুতর সমস্যা হিসেবে বিরাজ করছে। শিশুদেরকে ব্যাপকভাবে পাচার হচ্ছে মূলত ভারতে, পাকিস্তানে এবং দেশের অভ্যন্তরেও। এই সব পাচারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে পতিতাবৃত্তিতে এবং শ্রমদাস হিসেবে নিয়োজিত করা (অনুচ্ছেদ ৬.চ দ্রষ্টব্য)।

সরকারী সংবাদ সংস্থা বাসস ৫ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানায় যে আলোচ্য বছরে দেশে গৃহহীন শিশুর সংখ্যা ছিল চার লাখ। এদের মধ্যে ১ লাখ ৫০ হাজার শিশু তাদের মা-বাবা সম্পর্কে কিছু জানে না।

ইউনিসেফ-এর হিসাব মতে বাংলাদেশে প্রায় ১০,০০০ শিশু পতিতা রয়েছে। অন্যান্য হিসাব অনুযায়ী এই সংখ্যা ২৯,০০০। সরকারী সার্টিফিকেটসহ ১৮ বছরের অধিক বয়সী মেয়েদের জন্যে পতিতাবৃত্তি বৈধ। তবে কর্তৃপক্ষ সর্বনিম্ন বয়সের এই বিধানকে বয়স সম্পর্কিত মিথ্যা সার্টিফিকেটের মাধ্যমে সাধারণত উপেক্ষা করে থাকে। যারা নাবালিকাদেরকে পতিতাবৃত্তিতে নিয়ে এসেছে তাদের বিরুদ্ধে কদাচিৎ মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং সরকার অনুমোদিত পতিতালয়গুলোতে বিপুল সংখ্যক শিশু পতিতা কাজ করেছে।

যে সকল শিশুর মা-বাবা কারারুদ্ধ তাদের জন্য বিদ্যমান সুবিধাদির পরিমাণ অত্যন্ত কম। একটি এনজিও-র ভাষ্যমতে, বিগত বছরের সেপ্টেম্বর মাসের হিসাব অনুযায়ী সারা দেশে ১৬ বছরের কম বয়সী প্রায় ১২শ' শিশু তাদের মায়েদের সাথে কারাগারেই বসবাস করছিল।

শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত একটি সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী ৫৩৮ জন শিশুকে অপহরণ করা হয়েছে। অপহৃত শিশুদের পিতামাতারা মুক্তিপণের টাকা দিতে অপারগ হওয়ায় অপহরণকারীরা দুই জন শিশুকে হত্যা করেছে। একটি ঘটনায় ঢাকার একটি জেলা আদালত একজন অপহরণকারীকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করেছে। এই সংগঠনের ভাষ্য অনুযায়ী আলোচ্য বছরে ১,৫০০ শিশুর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে।

প্রতিবন্ধী নাগরিকবৃন্দ

বাংলাদেশের আইনে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রতি সমান আচরণ ও বৈষম্য থেকে সুরক্ষার বিধান রয়েছে। তবে বাস্তবে প্রতিবন্ধীরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার। সরকার ২০০১ সালে 'বাংলাদেশ শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন' পাশ করে যেখানে প্রতিবন্ধীদের স্বাভাবিক লোকেদের মতোই সমান অধিকার প্রদান করা হয়েছে। এই আইনে প্রতিবন্ধীদের শারীরিক অক্ষমতা প্রতিরোধ, চিকিৎসা, শিক্ষা, পুনর্বাসন ও চাকুরি, যানবাহনে সমান প্রবেশাধিকার এবং তাদের পক্ষে কথা বলার ওপর মনোনিবেশ করা হয়েছে। মানসিক প্রতিবন্ধী অথবা মানসিক রোগীদের চিকিৎসার জন্য সরকারী যে সব সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, সেগুলোও অপর্যাপ্ত।

প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কর্মরত ৮০টিরও অধিক এনজিও-এর একটি সমন্বয়কারী সংগঠন "ন্যাশনাল ফোরাম অব অরগানাইজেশনস ওয়ার্কিং উইথ দ্য ডিজএবলড্"-এর বিবরণ অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রায় ১৪ শতাংশ মানুষ কোন না কোন ধরনের শারীরিক অথবা মানসিক অক্ষমতা রয়েছে। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের যে বিশেষ ধরনের পরিচর্যা ও মনোযোগ প্রয়োজন, বাংলাদেশের বেশির ভাগ পরিবারই আর্থিক অসঙ্গতির কারণে তা প্রদান করতে পারে না। এছাড়াও, কুসংস্কার এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে এক ধরনের ভীতি বা আশংকার কারণে তারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

তবে, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা ও বৃত্তিমূলক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগে গৃহীত বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'সেন্টার ফর রিহ্যাবিলিটেশন অব দি প্যারালাইজ্ড' (সিআরপি) বিভিন্ন ধরনের শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশু ও বয়স্কদের জন্য তাদের সংস্থার ভেতরে এবং বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকে। এছাড়া পেশাগতভাবে যারা শারীরিক প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসার ওপর স্পেশালাইজেশন করেন তাদের জন্যও 'সিআরপি' একটি শিক্ষামূলক স্থাপনা পরিচালনা করে থাকে। শারীরিকভাবে অক্ষমদের গ্রামীণ জীবনের সাথে পুনরায় খাপ খাইয়ে নেবার জন্য 'সিআরপি' একটি আদর্শ গ্রাম পরিচালনা করে থাকে। শারীরিক প্রতিবন্ধীরা যাতে সমাজে ফিরে গিয়ে পুনরায় স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করতে পারে সেজন্য 'সিআরপি' তাদেরকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণ, এবং কর্ম সংস্থানের সুযোগ প্রদান করে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে তাকে। আলোচ্য বছরেও তাদের এই সহায়তা অব্যাহত ছিল। 'সিআরপি' অ্যাডভোকেসি, নেটওয়ার্কিং এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধমূলক প্রশিক্ষণও দিয়েছে। এসব ছাড়াও, দেশে নিরাপদ ও সুস্থ কাজের জায়গার পরিবেশ নিশ্চিত করতে নীতিমালা প্রণয়নের জন্য সেন্টার একটি ৩-বছরব্যাপী গবেষণা প্রকল্পেও নিয়োজিত ছিল। এজন্য উচ্চ-ঝুঁকিসম্পন্ন কর্মস্থল সনাক্তকরণ, কর্মক্ষেত্রে বা কাজ করার সময় আহত হলে সে লক্ষ্যে একটি ডাটাবেজ গড়ে তোলা, এবং মেরুদন্ডের সমস্যায় যারা সেবা দিয়ে থাকে তাদের একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করা হয়েছে। লাভজনক এবং অলাভজনক বেসরকারী খাতের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা তাদের প্রতিষ্ঠানের করণিক, থেরাপিস্ট, প্রশিক্ষক, এবং কম্পিউটার অপারেটর প্রভৃতি পেশাজীবী এবং অ-পেশাজীবী পদের জন্য শ্রবণঘাটতি সম্বলিত ব্যক্তিদেরকে কাজে নিয়েছে।

আদিবাসী নাগরিকবৃন্দ

উপজাতীয় জনগণের নিজেদের ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার খুব সামান্যই ক্ষমতা আছে। ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম (সিএইচটি) শান্তি চুক্তি সেখানকার ২৫ বছরের বিদ্রোহের অবসান ঘটিয়েছে, যদিও সেখানে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সমস্যা অব্যাহতই ছিল। ভূমি কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে উপজাতি ও বাঙ্গালী বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে ভূমি সম্পর্কিত বিরোধের মীমাংসা করা। তবে ভূমি সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানে এই কমিশন এই তেমন কার্যকর ও ফলপ্রসূভাবে কাজ করেনি। বিদ্রোহের সময় যে সব উপজাতীয় নাগরিক সংশিষ্ট এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তাদেরকে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে তেমন কোন অগ্রগতি না হওয়ায় উপজাতীয় নেতারা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

সরকার ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত নিয়মিতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অ-উপজাতি বাংলাদেশী বসতি স্থাপনকারীদের জমি বরাদ্দ করেন। এই সব জমির মধ্যে সেই জমিও অন্তর্ভুক্ত ছিল যেগুলো ভূমি মালিকানার সনাতন ধারা অনুযায়ী আদিবাসীরা দাবি করে থাকে। সরকার কর্তৃক জমি বন্দোবস্ত দেয়ার ফলে চাকমা ও মারমাসহ বহু উপজাতী গোষ্ঠী ভূমিচ্যুত হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশী বসতি স্থাপনকারীদের সংখ্যা ছিল এলাকার মোট জনসংখ্যার তিন শতাংশ। আর ১৯৯৭ সালে এই সংখ্যা বেড়ে

দাঁড়ায় এলাকার মোট জনসংখ্যার (১০ লক্ষ) প্রায় ৫০ শতাংশ। একটি উপজাতীয় গ্রুপ শান্তি বাহিনী ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিক থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তবে এই সংঘর্ষের মাত্রা তেমন তীব্র ছিল না। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হওয়া পর্যন্ত এই সংঘর্ষ চলতে থাকে। সংঘর্ষ চলাকালীন সময়ে -- আদিবাসী, বসতি স্থাপনকারী এবং নিরাপত্তা বাহিনী -- সকলেই একে অপরের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ উত্থাপন করে। পরস্পরের বিরুদ্ধে তাদের এই অভিযোগ এখনো অব্যাহত রয়েছে।

১৯৯৭ সালের শান্তি চুক্তিতে মূলতঃ উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার গঠনের কথা বলা হয়েছে। চুক্তির অন্যান্য শর্তাবলীর মধ্যে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সামরিক উপস্থিতি হ্রাস এবং গৃহচ্যুত উপজাতীয় পরিবারবর্গের জন্যে উলেখযোগ্য পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান। এই চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশী এবং উদ্বাস্তু উপজাতীয় পরিবারসমূহের মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিবাদ নিয়ে কাজ করার জন্য সরকার একটি ভূমি কমিশন গঠন করেছিল। শান্তি চুক্তি অনুযায়ী কমিশনের রায়ই হতো চূড়ান্ত এবং সেখানে আপীল করার কোন সুযোগ ছিল না। তবে ২০০১ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত ওই কমিশনের কোন আইনগত ভিত্তি ছিল না। উপরন্তু, বিদ্রোহ চলাকালীন সময়ে যে সকল উপজাতীয় নাগরিক সংশিষ্ট এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তাদেরকে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে তেমন কোন অগ্রগতি না হওয়ায় উপজাতীয় নেতারা অসন্তোষ প্রকাশ করা অব্যাহত রেখেছেন। শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনার জন্য সাবেক বিদ্রোহী নেতা সন্তু লারমা আলোচ্য বছরের এপ্রিল মাসে প্রধানমন্ত্রীর সাথে এবং জুলাই মাসে আইনমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে বসেন। এই আলোচনায় আরো যে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল সেগুলো হলো তিনটি পার্বত্য জেলায় জেলা আদালত গঠন করা এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের পথ খুঁজে বের করা।

চাঁদাবাজি এবং মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে অপহরণ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছিল অনিয়ন্ত্রিত ও বর্ধনশীল। জানুয়ারি মাসের ১৯ তারিখে 'ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট' (ইউপিডিএফ)-এর কথিত সদস্যরা খাগড়াছড়ি উপজেলার মাটিরাঙ্গায় তিন ব্যক্তিকে অপহরণ করে। ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সশস্ত্র তরুণরা ১০ জন ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে। স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক গঠিত একটি কমিটি আলোচনার মাধ্যমে আটজন অপহৃতকে মুক্তি দিতে সম্মত করায়। ২১শে ফেব্রুয়ারিতে এই আট ব্যক্তি মুক্তি লাভ করে। ফেব্রুয়ারির ১৩ তারিখে নানিয়ার চর থেকে অপহৃত দু'জন ব্যবসায়ীর অপহরণকারীরা মুক্তিপণ লাভ করার পর তাদের শিকারদেরকে মুক্তি দেয়। ১৯শে জুলাই 'ইউপিডিএফ'-এর কথিত সদস্যরা রাঙ্গামাটির তারাবুনিয়া ব্রিজ থেকে দু'জন জিপ চালককে অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি করে। ৩রা আগস্ট তারিখে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী উপজাতীয় গোষ্ঠীর কিছু সংখ্যক মুখোশধারী লোক অন্য একটি উপজাতীয় গোষ্ঠীর ছয় ব্যক্তিকে অপহরণ করে বান্দরবান জেলার শঙ্খ নদীর তীরে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করে।

২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি জেলার একটি রাস্তা থেকে বন্দুকের মুখে তিনজন বিদেশী প্রকৌশলীকে অপহরণ করা হয়। ওই বছরের মার্চে তাদের মুক্তি দেয়ার পর জিম্মিদের একজন একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদককে জানান, অপহরণকারীদের একজন তাকে গোপনে বলেছিল যে তাদের লক্ষ্য রাজনৈতিক ছিল না, বরং তারা চাকমা জনগণের কল্যাণের জন্য অর্থ আদায় করতে চেয়েছিল। ওই ঘটনার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় দাতাদের সহযোগিতায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম স্থগিত হয়ে পড়ে আছে।

জাতিসংঘ জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি)-র অধীনে সরকারী ও দাতা সংস্থাসমূহের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি মিশন আলোচ্য বছরের ১লা জুন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং সেখানে আবার নতুন করে উন্নয়ন সহযোগিতার সম্ভাবনা বিষয়ে ১১-দিনব্যাপী একটি জরিপ চালায়।

পরবর্তীতে তাদের প্রদত্ত রিপোর্টে দলটি জানায়, আঞ্চলিক দলীয় কোন্দল এবং চাঁদাবাজ চক্রগুলোর উপস্থিতির কারণে উন্নয়ন কর্মীদের অপহরণ এবং চাঁদাবাজি এখনো অব্যাহত রয়েছে। তবে রিপোর্টে আরো বলা হয় যে এই পার্বত্য এলাকার বেশির ভাগ অঞ্চলের নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নত হয়েছে এবং তা পুনরায় উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করার জন্য যথেষ্ট ভালো। তবে উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয়দের মধ্যে মতপার্থক্য, ভূমি, নির্বাচন এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সংক্রান্ত যে সব অমীমাংসিত বিষয় রয়েছে তাতে করে উত্তেজনা সৃষ্টি এবং সংঘাতের সম্ভাবনা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

দুই হাজার এক সালের জুন মাসে একজন কথিত উপজাতীয় সদস্য পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলাতে একজন বাংলাদেশী ট্রাক চালককে হত্যা করে। এই হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ জানানোর জন্য বাংলাদেশীরা এক সমাবেশ করে এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবার দাবি জানায়। এই সমাবেশ চলাকালে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। এর ফলে বাংলাদেশী ও উপজাতীয়দের মধ্যে উদ্ভুত সংঘর্ষে একজন পুলিশসহ ১৮ ব্যক্তি আহত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশীরা উপজাতীয়দের ১শ'টিরও বেশি বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। সরকার সেখানে পেনাল কোডের ১৪৪ ধারা জারি করে যার অধীনে জনগণের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি এমন যে কোন অবৈধ সমাবেশের জন্য গ্রেফতার করা অনুমোদন করে। ট্রাক চালকের হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত থাকার কারণে পুলিশ ৬ জন উপজাতীয় নাগরিককে এবং আগুন লাগানোর অভিযোগে আরো ১৫ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে।

একটি মানবাধিকার সংগঠনের ভাষ্য অনুযায়ী, ২০০০ সালের আগস্ট মাসে কিছু বাংলাদেশী একটি জমি নিয়ে বিরোধে সাঁওতাল উপজাতির একজন নেতা আলফ্রেড সরেনকে হত্যা করে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। যদিও এই হামলাতে জড়িত থাকার জন্য ৯১ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয় কিন্তু গ্রেফতার করা হয় চার ব্যক্তিকে। ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সরকার ক্ষতিপূরণ হিসেবে সরেনের পরিবারকে আনুমানিক ৫০ হাজার টাকা (৯শ' ২৬ ডলার) এবং আহত ৯ জনের প্রত্যেকের পরিবারকে আনুমানিক ১০ হাজার টাকা (১শ' ৮৫ ডলার) করে প্রদান করে।

অন্যান্য এলাকার উপজাতীয় মানুষও বাঙ্গালী মুসলমানদের কাছে তাদের জমি হারানোর বিষয়টি উলেখ্ব করেছেন। মধুপুর বন অঞ্চলে বসবাসকারী গারো জনগোষ্ঠীরও বন উজাড় করা এবং জমি দখলের কারণে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে অব্যাহতভাবে সমস্যার সম্মুখীন হওয়া অব্যাহত থেকেছে। গারো সম্প্রদায়ের ওপর এই চাপের ফলে তারা জীবিকার জন্য ব্যাপকহারে শহরাঞ্চলের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ছে এবং প্রতিবেশী ভারতের মেঘালয় রাজ্যে চলে যাচ্ছে। এর ফলে মাত্র ১৬,০০০ লোকের এই ছোট্ট সম্প্রদায়টির অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।

২০০১ সালের ইস্টার সানডে-তে মৌলভি বাজারে প্রধানতঃ খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী খাসিয়া পল্লীতে বন বিভাগ একটি ইকো-পার্কের উদ্বোধন করে। যদিও আদিবাসী খাসিয়ারা এখানে পুরুষাণুক্রমে বাস করে আসছিল, কিন্তু সরকার এই জমির ওপর তাদের মালিকানা স্বীকার করছিল না। সরকার এই জমির মালিকানা দাবি করে বলেছিল যে খাসিয়ারা অবৈধভাবে এই জায়গা দখল করে আসছিল। ইকো-পার্ক প্রকল্প বাস্ত বায়নের জন্য সরকার আলোচ্য বছরে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করেনি, তবে এই প্রকল্প এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল হয়ে যায়নি।

আলোচ্য বছরের ২১শে জুলাই বন বিভাগের কর্মকর্তারা মৌলভি বাজারের একটি গ্রাম থেকে খাসিয়া উপজাতির সদস্যদের উচ্ছেদ করে। উচ্ছেদের পর খাসিয়ারা আবার গ্রামে ফিরে এলে তাদেরকে উচ্ছেদ

করার এক প্রচেষ্টায় বন বিভাগের রক্ষীরা খাসিয়া সদস্য অবিনাশকে গুলি করে হত্যা করে এবং তাদের গুলিতে আরো ১০ জন খাসিয়া আহত হয়। দু'জন বনরক্ষী তীরের আঘাতে আহত হয়। এই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত থাকার কারণে বছরের শেষ পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেনি।

২০০১ সালের এপ্রিল মাসে মৌলভি বাজারে বাঙ্গালী এবং খাসিয়াদের মধ্যে জমি নিয়ে এক সংঘর্ষে এক ব্যক্তি নিহত হয় এবং আরো ১০ জন আহত হয়। একই বছরের শেষের দিকে ইউনিয়ন পরিষদের একজন সাবেক সদস্যের নেতৃত্বে ৫০ থেকে ৬০ জন বাঙ্গালীর একটি দল খাসিয়াদের একটি গ্রামে হামলা চালায়। এই হামলায় ৫০ জন লোক আহত হয়। এদের বেশির ভাগই খাসিয়া।

অনুচ্ছেদ ৬ শ্রমিকদের অধিকার

ক. সমিতি করার অধিকার

সংবিধানে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তির সমিতিতে যোগদান করার এবং সরকারের অনুমতি নিয়ে সমিতি গঠন করার অধিকার রয়েছে। তবে বাস্তবে সরকার এটার প্রতি সব সময় শ্রদ্ধাশীল ছিল না। দেশে মোট শ্রমজীবীর সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি ৮০ লাখ। এর মধ্যে ১৮ লাখ নানা ইউনিয়নের সাথে যুক্ত। এই সব ইউনিয়নের বেশীরভাগ আবার কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত। ইনফরমাল সেক্টর বা অপ্রচলিত খাতে কর্মরত শ্রমজীবী সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন পরিসংখ্যান নেই। এই খাতে কর্মরত রয়েছেন দেশের মোট শ্রমশক্তির ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ।

কোন কারখানায় ইউনিয়ন নিবন্ধীকরণ করতে হলে তাতে সেখানকার শ্রম শক্তির ৩০ শতাংশের অংশগ্রহণ আবশ্যক করা হয়েছে। তাছাড়া, নিবন্ধীকরণের আগে সম্ভাব্য ইউনিয়নকর্মীদের অনেক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা থেকেও নানা অজুহাতে বিরত রাখা হয়। এই সময়ে মালিকরা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নিলেও তার বিরুদ্ধেও কোন আইনী সুরক্ষা নেই। শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীরা প্রতিবাদ জানিয়েছেন যে, এই বিধান শ্রমিকদের সংগঠন করার, বিশেষ করে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলোতে এবং বেসরকারী খাতে সংগঠন করার স্বাধীনতা মারাত্মকভাবে খর্ব করছে। একই কারণে আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন (আইএলও) ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধীকরণের জন্য ৩০ শতাংশ শ্রমিকের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করার বিধানটি সংশোধনের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছে। বিভিন্ন কর্মস্থলে বিভিন্ন মালিকের কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের নিয়ে ইউনিয়ন গঠন করা হলে তার নিবন্ধীকরণ না করার যে আইনগত বিধান আছে তা সংশোধন করার জন্যও আইএলও সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছে। আনুমানিক ৫,৪৫০টি শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে প্রায় ১৫ শতাংশ সরকারীভাবে নিবন্ধিত ২৫টি জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাথে সংশিষ্ট বা অঙ্গীভূত। অনিবন্ধিত আরো কয়েকটি জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন (এনটিইউ) কেন্দ্র রয়েছে।

রেল, ডাক, তার, টেলিফোন বিভাগের শ্রমিকরা ইউনিয়নে যোগ দিতে পারেন, কিন্তু সরকারী কর্মচারী, পুলিশ ও সামরিক বিভাগের কর্মীদের কোন ইউনিয়নে যোগ দেয়া নিষিদ্ধ। এর প্রধান কারণ হচ্ছে এ ধরনের ইউনিয়ন অত্যন্ত রাজনৈতিক চরিত্রের হয়ে থাকে। এছাড়া শিক্ষক ও নার্সদের মতো যে সব সরকারী কর্মচারীদের ইউনিয়নে যোগ দেয়া নিষিদ্ধ, তারা তাদের সদস্যদের কল্যাণ সাধন, আইনগত সেবাদান, ও অভিযোগ জানানোর উদ্দেশ্যে সমিতি গঠন করেছে যেগুলো শ্রমিক ইউনিয়নের অনুরূপ কর্মকান্ড চালায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী এবং সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতের নির্মাণ ও পরিবহন শিল্পের কিছু শ্রমিক কয়েকটি অনিবন্ধিত ইউনিয়ন গঠন করেছে।

১৯৯৯ সালে 'আইএলও'-র বিশেষজ্ঞ কমিটি জানায় যে বস্ত্র শিল্প, ধাতব শিল্প ও পোশাক শিল্প খাতে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধীকরণের কয়েকটি আবেদন সরকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যান ছিল অযৌক্তিক। শ্রম মন্ত্রণালয় দাবী করে যে, এই সব অনুরোধপত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিল না।

শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর রাজনৈতিক কর্মকান্ড চালাতে আইনগত কোন বাধা ছিল না; কিন্তু শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর দেশব্যাপী হরতাল এবং যানবাহন চলাচলে অবরোধ আহ্বান রাজনৈতিক কর্মকান্ডের চেয়ে অপরাধমুলক কর্মকান্ড হিসাবে শ্রম মন্ত্রণালয় বিবেচনা করত এবং এজন্য এসব নিষিদ্ধ ছিল।

ইউনিয়নগুলো অত্যন্ত রাজনৈতিক চরিত্রের এবং সেগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এবং চট্টগ্রামে সরকার পরিচালিত বন্দরের মতো স্থাপনাগুলোতে অত্যন্ত শক্তিশালী। বস্তুতঃ প্রায় সবগুলো 'এনটিইউ'-ই রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীভূত। কিছু ইউনিয়ন ভয়ভীতি প্রদর্শন ও ধংসাত্মক কাজে নিয়োজিত। অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন চক্রের নিয়ন্ত্রণ বা চাঁদার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে তাদের মধ্যে প্রায়ই লড়াই বাঁধে। সাধারণতঃ ছুরি, বন্দুক ও দেশী বোমা এসব সংঘর্ষে ব্যবহৃত হয়। 'আইসিএফটিইউ' জানায়, ওয়ার্কার্স ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সেক্রেটারী জেনারেল ইকবাল মজুমদারকে ২০০১ সালের ২রা আগস্ট গুলি করে হত্যা করা হয়।

শ্রমিকরা ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী পদে আসীন হতে পারেন। ইউনিয়ন সদস্যদের সংখ্যানুপাতে কার্যনির্বাহী পদের সংখ্যা কত হবে তা আইন কর্তৃক নির্দিষ্ট। ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রার শ্রম আদালতের সম্মতি নিয়ে কোন ইউনিয়নের নিবন্ধীকরণ বাতিল করতে পারেন। আলোচ্য বছরে এমন কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে জানা যায়নি।

শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে নিবন্ধিত ইউনিয়ন বা ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের দেওয়ানি দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার বিধান রয়েছে। এই সব বিধানের প্রয়োগ অবশ্য অসম। অতীতে পরিবহন অবরোধের মতো অবৈধ কর্মকান্ডের জন্য পুলিশ ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের বিশেষ ক্ষমতা আইনে বা নিয়মিত ফৌজদারী বিধিতে গ্রেফতার করেছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনগুলোর সাথে তালিকাভুক্ত হতে কোন বিধিনিষেধ নেই। ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলো এ ধরনের বিভিন্ন যোগাযোগ রক্ষা করেছে। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদেরকে আইএলও'র সভায় যোগ দিতে বিদেশ ভ্রমণের জন্য সরকারের অনুমতি সংগ্রহ করতে হয়। এই ধরনের অনুমতি দিতে অস্বীকারের কোন খবর এই বছরে পাওয়া যায়নি।

নভেম্বর মাসে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে সমিতি করার অধিকার সংক্রান্ত 'আইএলও' কমিটি জানায়, শ্রমিক ইউনিয়ন করার অপরাধে বাংলাদেশ ডিপোমা নার্সেস এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্য সদস্যদের ওপর হয়রানি করার ও ব্যবস্থা নেয়ার যে অভিযোগ ছিল তা কমিটি পর্যালোচনা করে দেখে। 'আইএলও' জানায়, ২০০১ সালের অক্টোবরে কথিত এক বেআইনী বৈঠকে যোগ দেয়ার অপরাধে তাপসী ভট্টাচার্যকে তার হাসপাতালের চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।

সমিতি করার অধিকার সংক্রান্ত 'আইএলও'-র বিশেষজ্ঞ কমিটি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে কতিপয় পরিবর্জন, ইউনিয়নের সদস্যপদ লাভে এবং ইউনিয়ন কর্মকর্তা পদে নির্বাচিত হবার ক্ষেত্রে কতিপয় বাধা নিষেধ, সরকারী কর্মকর্তা সমিতির কর্মকান্ডেও ওপর বাধা-নিষেধ, রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় যৌথভাবে সংগঠিত হবার এবং দর কষাকষি করার অধিকারের ওপর বাধা-নিষেধ এবং হরতাল করার অধিকারের ওপর বাধা-নিষেধ লক্ষ্য করেছে।

খ. সংগঠিত হবার এবং যৌথ দরকষাকষি করার অধিকার

শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে মালিকদের দ্বারা ইউনিয়ন কর্মী ও সংগঠকদের প্রতি বৈষম্য করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, এই অধ্যাদেশে ইউনিয়ন কর্মকান্ডের সংগে জড়িত বলে সন্দেহে শ্রমিকদের জোর করে বদলী করার বা কর্মচ্যুতির বিধান রয়েছে। তবে কর্মচ্যুতির জন্য ২ সপ্তাহের বেতন প্রদান বাধ্যতামূলক। কার্যতঃ বেসরকারী খাতের নিয়োগকর্তারা সাধারণত কখনো কখনো স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় যে কোন ধরনের ইউনিয়ন কর্মকান্ডকে নিরুৎসাহিত করে থাকে।

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রার বৈষম্যের অভিযোগ সম্পর্কে রায় দিয়ে থাকেন এবং অনেক মামলায় শ্রম আদালত ইউনিয়ন কর্মকান্ডের জন্য বরখাস্তকৃত শ্রমিকদের পুনর্বহালের আদেশ দিয়েছেন। যাহোক, মামলা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকার কারণে শ্রম আদালতের কার্যকারিতা সার্বিকভাবে ব্যাহত হয় এবং অতীতে নিয়োগকর্তারা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে শ্রম আদালতের রায়কে পাল্টে দিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

শ্রমিকদের যৌথ দর কষাকষি বৈধ তবে শর্ত থাকে যে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক যৌথ দর কষাকষির এজেন্ট হিসেবে বৈধভাবে রেজিস্ট্রিকৃত ইউনিয়নই কেবল তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। শ্রমিক ইউনিয়নগুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীভূত। তাই যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে সাধারণতঃ এক বা একাধিক ইউনিয়ন থাকে (একটি রাজনৈতিক দলের এক বা একাধিক ইউনিয়ন)। যৌথ দরকষাকষিতে অংশ নেয়ার জন্য প্রতিটি ইউনিয়নকে যৌথ দরকষাকষি কর্তৃপক্ষ কমিটিতে তার প্রতিনিধি মনোনীত করতে হয়। মনোনয়ন প্রক্রিয়া পর্যালোচনার পর রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন তা অনুমোদন করেন। ওষুধ শিল্প, পাট শিল্প বা বস্ত্র শিল্পের মতো বড় বড় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে যৌথ দর কষাকষি ঘটে থাকে। তবে বেকারত্বের উচ্চ হারের কারণে শ্রমিকরা চাকুরীর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে যৌথ দর কষাকষিতে নাও যেতে পারে। ক্ষুদ্র বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে যৌথ দর কষাকষি সাধারণতঃ হয় না। 'দি ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব ফ্রি ট্রেড ইউনিয়নস' তাদের ভাষায় এই ধরনের দর কষাকষির ক্ষেত্রে আইনগত অন্তরায়ের জন্য সরকারের সমালোচনা করেছে।

জাতীয় বেতন ও মজুরী কমিশন বেসরকারী খাতের শ্রমিকদের বেতন স্তর ও অন্যান্য সুবিধা নির্ধারণ করে। এই কমিশনের সুপারিশসমূহ বাধ্যতামূলক এবং এর বাস্তবায়নের সমস্যা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে না।

আইনে শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকারের সুনির্দিষ্ট স্বীকৃতি নেই। তবে শ্রমিকদের সাধারণ প্রতিবাদের অস্ত্র হিসাবে এটাই প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সরকারের কাছ থেকে তাদের রাজনৈতিক দাবী আদায়ের উপায় হিসাবে সাধারণ ধর্মঘটের আশ্রয় নিয়েছে। প্রস্তাবিত একটি নতুন বেসরকারী কন্টেইনার বন্দর নির্মাণের প্রতিবাদে দেশের বড় পোতাশ্রয় চট্টগ্রাম বন্দরের শ্রমিকরা

কয়েক দফা কর্ম বিরতি পালন করেছে। ঐ বছর সরকার বন্দরের চাকুরীকে অত্যাবশ্যকীয় ঘোষণা করার আগে পর্যন্ত কর্ম বিরতি একটা নিয়মে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। আলোচ্য বছরে পেশাদার সমিতি বা অনিবন্ধিত ইউনিয়নভুক্ত কিছু কর্মচারী ধর্মঘট করেছে। তাৎক্ষণিক ধর্মঘট অবৈধ, তবে, প্রায়শঃই এটা ঘটে থাকে আর এ ধরনের তাৎক্ষণিক ধর্মঘটে সরকারের প্রতিক্রিয়া সব সময় এক হয় না। পরিবহন খাতেই এই ধরনের ধর্মঘট হয়েছে সবচেয়ে বেশী।

১৯৫৮ সালের অত্যাবশ্যকীয় চাকুরী অধ্যাদেশে সরকারকে অত্যাবশ্যকীয় ঘোষিত যে কোন খাতে ৩ মাস ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আলোচ্য বছরে সরকার এই ক্ষমতা বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কতৃপক্ষ, চট্টগ্রাম বন্দর এবং গ্যাস ও জ্বালানী খাতের ৯টি কোম্পানীর বেলায় প্রয়োগ করেছে। অতীতে সরকার বিমান পাইলট, পানি সরবরাহ কর্মী এবং শিপিং কর্মীদের ওপর এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। সরকার ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার এই সময়সীমা আরো ৩ মাস বাড়াতে পারে। ধর্মঘট ও লক আউট শুরু হবার আগে বা পরে এই ধর্মঘট ও লক আউটকে বেআইনী ঘোষণা করার ক্ষমতা সরকারকে দেয়া হয়েছে। সরকার এ নিয়ে শ্রম আদালতে মামলাও করতে পারে।

শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে আপস, মধ্যস্থতা এবং শ্রম আদালতের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান রাখা হয়েছে। বিরোধের নিষ্পত্তি না হলে ধর্মঘটে যাবার অধিকার শ্রমিকদের রয়েছে। যদি ৩০ দিন ধরে ধর্মঘট চলে তাহলে সরকার ধর্মঘট নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য শ্রম আদালতে পাঠাতে পারে; যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোয় এমনটি ঘটেনি। ধর্মঘটে যেতে হলে শ্রমিক সংগঠনের তিন চতুর্থাংশ সদস্যের ঐকমত্যের প্রয়োজন বলে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে যে বিধান রয়েছে এবং সেই অধ্যাদেশের আওতায় যে কোন সময়ে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার যে ক্ষমতা সরকারের রয়েছে, 'আইএলও' তার সমালোচনা করেছে।

আলোচ্য বছরে দেশের ৫টি রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকাকে (ইপিজেড) শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন, শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ এবং কারখানা আইনের আওতা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এই সব আইনে শ্রমিকদেরকে সমিতি গড়ার অধিকার, যৌথভাবে দর কষাকষি করে মজুরি, কাজের সময়, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য সুবিধাদি নির্ধারণের অধিকার দেয়া হয়েছে। রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা বিধানে এই সব অধিকারের কিছু কিছু বিকল্প বাস্তবায়ন করা হলেও পেশাদারী ও শিল্প ভিত্তিক ইউনিয়ন গঠন রফতানি প্রক্রিয়া এলাকায় নিষিদ্ধ। এই সব বিধান বাস্তবায়নের দায়িত্ব আবার রফতানি প্রক্রিয়াকরণ কতৃপক্ষের ওপর। সামান্য সংখ্যক শ্রমিক রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় সমিতি গঠনের বাধা নিষেধ এড়িয়ে সমিতি গঠন করেছে। বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, শ্রমিকরা শ্রমিক কল্যাণ কমিটিসমুহ এবং বিরোধ নিষ্পত্তি ট্রাইব্যুনালে প্রতিনিধি দেয়। এই উভয় সংগঠনের লক্ষ্য হলো কর্মস্থলে সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তিতে শ্রমিক ও ম্যানেজারদের আরো অভিজ্ঞতা দেয়া। ২০০০ সালে সরকার এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, ২০০৪ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখের মধ্যে রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় শ্রম আইনের সকল ধারা বলবৎ করা হবে।

বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াকরণ (বিইপিজেড) অঞ্চল কর্তৃপক্ষ জানায়, ঢাকা রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় প্রায় ৪৪,০০০, চট্টগ্রাম এলাকায় ৭৬,০০০ এবং অন্য তিনটি রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় ১,৪০০ জন শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আন্তর্জাতিক শ্রম আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত তার ২০০১ সালের রিপোর্টে শ্রম আইনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতির অভাবে নিন্দা প্রকাশ করেছে এবং শ্রম আইনের সাথে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কতিপয় বিধানের অসঙ্গতির নিন্দা করেছে। এসব অসঙ্গতির মধ্যে রয়েছে সমিতি গড়ার অধিকার এবং যৌথ দরকষা-কষি সংক্রান্ত। আলোচ্য বছরে আইএলও বিশেষজ্ঞ কমিটির

প্রতিবেদনে বলা হয় যে, বেসরকারী খাতে স্বেচ্ছামূলক দর-কষাকষি, হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আইনগত রক্ষা ব্যবস্থা না থাকা, ইউনিয়ন বিরোধী বৈষম্যের বিরুদ্ধে আইনী রক্ষা ব্যবস্থা না থাকা এবং যৌথভাবে দর কষাকষির অধিকার প্রয়োগের বেলায় বিশেষ সমস্যা রয়েছে।

গ. বলপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা

সংবিধানে শিশুশ্রমসহ বলপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রম নিষিদ্ধ, তবে সরকার এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করেনি। বলপূর্বক শ্রমের ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্য 'ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট' এবং 'শপস অ্যান্ড এস্টাবিশমেন্ট অ্যাক্ট'-এ কলকারখানা পরিদর্শনের ব্যবস্থা আছে, তবে তা কঠোরভাবে কার্যকর করা হয় না অংশতঃ সম্পদের স্বল্পতার কারণে। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রম দাসত্ব নেই। অবশ্য অনেক শিশুসহ অসংখ্য গৃহ পরিচারক-গৃহপরিচারিকা দাসত্বের পরিবেশে কাজ করে। তাদের অনেকে দৈহিক নিপীড়নের শিকার হয় এবং এ কারণে কখনো কখনো তাদের মৃত্যুও ঘটে থাকে। গৃহ পরিচারিকাদের ওপর কি কি ধরনের নির্যাতন হয়ে থাকে তার চিত্র তুলে ধরে স্থানীয় একটি এনজিও ২০০১ সালে একটি সমীক্ষা প্রকাশ করে। সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ৭ টি শিশুর ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে, শারীরিক নির্যাতেন ৩টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে, ২ জনকে ধর্ষণ করা হয়েছে এবং অন্য ১৯ জন নানা ভাবে নিগৃহীত হয়েছে। সরকার অতীতে ভৃত্যদের ওপর নির্যাতনকারী গৃহকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছে; তবে অনেক গরীব বাবা-মা আর্থিক ক্ষতিপূরণ নিয়ে ঘটনার নিষ্পত্তি করেছেন।

২০০০ সালে 'আইএলও' উলেখ করে যে ফৌজদারী দন্ড বিধির কতিপয় ধারা, বিশেষ ক্ষমতা আইন, শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ, এবং দি কনট্রোল অব এমপয়মেন্ট অর্ডিন্যান্স-এ রাজনৈতিক মত প্রকাশ বা প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মত প্রকাশের শাস্তি হিসেবে, শ্রম শৃঙ্খলা ভঙ্গের শাস্তি হিসেবে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ধর্মঘটে অংশগ্রহণের শাস্তি হিসেবে সশ্রম কারাদন্ড প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যানবাহন চলাচলে বাধাদান, যা হরতালে একটি সাধারণ ব্যাপার, এমন অপরাধের জন্য ১৪ বছরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া, বাংলাদেশ মার্চেন্ট শিপিং অর্ডিন্যান্স-এর আওতায় নাবিকদের তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য জোর করে জাহাজে তুলে দেয়া হতে পারে। যাহোক, আলোচ্য বছরে এসব বিধান প্রয়োগের কথা জানা যায়নি।

ঘ. শিশু শ্রম পরিস্থিতি এবং চাকুরীর ন্যূনতম বয়স

শিশুদের কাজে নিযুক্তি নিষিদ্ধ করে কোন অভিন্ন আইন নেই এবং শিশুশ্রম একটি গুরুতর সমস্যা। কিছু কিছু আইনে কয়েকটি নির্দিষ্ট খাতে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ। কারখানা আইনে কলকারখানায় ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের কাজ করা নিষিদ্ধ। এই আইনে আরো বলা হয়েছে যে শিশু ও কিশোরদের সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে সর্বোচ্চ পাঁচ ঘন্টা কাজ করানো যেতে পারে। 'শপস অ্যান্ড এস্টাবিশমেন্ট অ্যাক্ট' অনুযায়ী বাণিজ্যিক কর্মস্থলে ১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের নিযুক্তি নিষিদ্ধ। শিশু কর্মসংস্থান অ্যাক্ট অনুযায়ী রেলে বা বন্দরে মাল ওঠানামার কাজে ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের নিয়োগ নিষিদ্ধ।

ব্যাপক দারিদ্র্যের কারণে অনেক শিশু খুব অল্প বয়সে কাজ করতে শুরু করে। সরকারী হিসাব অনুযায়ী পাঁচ থেকে ১৪ বছর বয়সের আনুমানিক ৬৬ লাখ শিশু কাজ করে। ২০০টি বিভিন্ন ধরনের কাজে

শিশুদের নিয়োজিত থাকতে দেখা যায়। এগুলোর মধ্যে ৪৯টিকে শিশুর দৈহিক ও মানসিক কল্যাণের জন্য ক্ষতিকর বলে বিবেচনা করা হয়। কখনো কখনো শিশুরা কর্মস্থলে গুরুতরভাবে আহত হয় বা মারা যায়।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, অক্টোবর মাসে ১২ বছর বয়সী এক গৃহভৃত্যকে এক চামচ দুধ বিনা অনুমতিতে খাওয়ার অপরাধে বেদম প্রহার করা হয় এবং তাকে টয়লেটে আটকে রাখা হয়। অক্টোবর মাসে গৃহকর্তার প্রচন্ড মারে আহত ১৪ বছর বয়সী এক কাজের মেয়েকে গুরুতর জখম নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আলোচ্য বছরে নির্যাতনে কয়েকজন প্রাপ্তবয়স্ক গৃহভৃত্যের মৃত্যু ঘটার খবর পাওয়া গেলেও কোন শিশু গৃহভৃত্যের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে পোশাক কারখানায় অগ্নিকান্ডে ১০টি শিশু শ্রমিক প্রাণ হারায়।

শিশুরা প্রায়শঃই ছোট ও প্রান্তিক কৃষি জমিতে পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে কাজ করে। সাধারণতঃ তাদেরকে কাজ করতে হয় দীর্ঘ সময় ধরে এবং তারা মজুরিও পায় কম। কখনও কখনও তাদের কাজের পরিবেশও থাকে ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়াও শিশুরা রিকশা চালায়, নির্মাণ কাজের ইট ভাঙ্গে, বাজারে ব্যবসায়ীদের জন্য ফল, শাক-সব্জী ও অন্যান্য শুকনো পণ্য বয়ে নেয় এবং চায়ের দোকানে কাজ করে। অনেক শিশুশ্রমিক চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে চিংড়ি পোনা ধরা, ডিপোতে কাজ করা এবং চিংড়ির মাথা ছেঁড়ার কাজ করে থাকে। অনেক শিশুশ্রমিক বিড়ি শিল্পে কাজ করে। চামড়া শিল্পে ১৮ বছরের কম বয়সী অনেকে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করে। শিশুরা নিয়মিতভাবে ঘর-বাড়ির কাজ করে। যে সব গৃহকর্তা ভৃত্যদের ওপর অত্যাচার করেছে অতীতে সরকার তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনে ব্যবস্থা নিয়েছে। দেশের প্রচলিত আইনে বলা রয়েছে যে প্রতিটি শিশুর ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বা ১০ বছর বয়স পর্যন্ত লেখা পড়া করা বাধ্যতামুলক। এই আইন কার্যকরভাবে বলবৎ করার কোন প্রক্রিয়া নেই।

রপ্তানিভিত্তিক পোশাক শিল্পের বাইরে শিশু শ্রম বিষয়ক আইন কার্যত কার্যকর করা হয় না। শিশুশ্রম বিষযক বিধান লঙ্ঘনের জন্য যে জরিমানার বিধান রয়েছে তার পরিমাণ খুবই সামান্য, ৪ ডলার থেকে ১০ ডলার পর্যন্ত (২২৮ টাকা থেকে ৫৭০ টাকা পর্যন্ত)। ১৮০,০০০টি রেজিস্ট্রিকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পর্যবেক্ষণের জন্য শ্রম মন্ত্রণালয়ের কাছে মাত্র ১১০ জন পরিদর্শক রয়েছে। ১৫ লাখের বেশি শ্রমিকদের সংগে সংশিষ্ট শ্রম আইন বলবৎ করার দায়িত্ব এই পরিদর্শকদের ওপর ন্যস্ত। অধিকাংশ শিশু শ্রমিক কাজ করে কৃষি ও অন্যান্য অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে, যেখানে কোন সরকারী নজরদারী নেই।

পোশাক খাত থেকে শিশুশ্রম নির্মুল করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানীকারক সমিতি (বিজিএমইএ) সদস্যভুক্ত কারখানা পরিদর্শন করে থাকে। আলোচ্য বছরে যে ৩,৩৪০টি কারখানা তারা পরিদর্শন করে তাতে দেখা যায় ৭১টি সদস্য কারখানায় ১৫৫ জন শিশু শ্রমিক কর্মরত আছে। 'আইসিএফটিইউ'-এর ভাষ্য অনুযায়ী পোশাক শিল্পে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা তাৎপর্যপূর্ণ হারে হ্রাস পেয়েছে। ১১৯৫ সালে যেখানে ৪৩ শতাংশ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প কারখানা শিশু শ্রম ব্যবহার করেছে, ২০০১ সালে সেই সংখ্যা ৫ শতাংশে নেমে এসেছে। 'বিজিএমইএ' প্রতিটি কারখানাকে প্রায় ১০০ ডলার (৫,৭০০ টাকা) করে জরিমানা করে। সাবেক শিশু শ্রমিকদের ইউনিসেফ-এর উদ্যোগে পরিচালিত স্কুলগুলোতে পড়াশুনার পাশাপাশি তাদের উপার্জনের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে প্রতিমাসে সামান্য বৃত্তিও দেয়া হয়।

ইউনিসেফ সরকারের অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পরিদপ্তর ও কয়েকটি পার্টনার এনজিও-র সহযোগিতায় সারা দেশের শহরগুলোর বস্তিতে সাড়ে তিন লাখ শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে একটি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। এরা প্রধানত শ্রমজীবী শিশু। সরকার, এনজিও এবং কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়নের সহযোগিতায়

আইএলও/আইপিইসি (শিশুশ্রম নির্মূলের জন্য আন্তর্জাতিক কার্যক্রম) একটি ২০ দফা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে কর্মরত আনুমানিক ৬ হাজার শিশু। এই কার্যক্রমের লক্ষ্য হলো তাদের কাজ থেকে সরিয়ে না এনে বরং শিক্ষা দান করা। 'আইএলও'-র এই সর্ববৃহৎ কার্যক্রমে নজর দেয়া হয়েছে রাসায়নিক দ্রব্য ও অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে কাজসহ বিপজ্জনক পেশায় নিয়োজিত শিশুদের ব্যাপারে। এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায় শুরু হয়েছে ২০০১ সালের আগস্ট মাসে। বিপজ্জনক পেশা থেকে প্রায় ৩০ হাজার শিশুকে সরিয়ে আনা এবং তাদের জায়গায় তাদের আরো ১৫ হাজার ছোট ভাই-বোনেরা যাতে এসব পেশায় ঢুকতে না পারে সে লক্ষ্যে বিড়ি কারখানা, নির্মাণ শিল্প, ট্যানারি, ম্যাচ ফ্যাক্টরি ও ঘরবাড়িতে কাজের ওপর নজর দেয়া হয়েছে। 'শিশু শ্রম নজরদারি সামাজিক সম্পদ কেন্দ্র' খোলার জন্য আইএলও ২৪টি এনজিও পার্টনারের সঙ্গে চুক্তি করেছে। এ যাবৎ ১৮,০০০ শিশু শ্রমিক অ-প্রাতিষ্ঠানিক ক্লাসে যোগ দিচ্ছে এবং ২,০০০ শিশু শ্রমিককে প্রাতিষ্ঠানিক স্কুলে পাঠানো হয়েছে। মোট ১,৬৮১ জন শিশু শ্রমিককে বিপজ্জনক পেশা থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে। এ ছাড়াও ৬টি বিড়ি কারখানা স্থানীয় শিশু শ্রম নজরদারি সামাজিক সম্পদ কেন্দ্রের সাথে চুক্তি করে তাদের কারখানাকে "শিশু শ্রম মুক্ত" ঘোষণা করেছে।

সংবিধানে জোর পূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রম নিষিদ্ধ। এর মধ্যে বাধ্যতামূলক শিশুশ্রমও অন্তর্ভুক্ত। সরকার অবশ্য এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকরভাবে বলবৎ করেনি।

ঙ. কাজের গ্রহণযোগ্য পরিবেশ

জাতীয় ভিত্তিতে কোন ন্যূনতম মজুরি ছিল না। এর পরিবর্তে কয়েক বছর পর পর গঠিত মজুরি কমিশন শিল্পভেদে দক্ষতা বিচার করে মজুরি ও ভাতা নির্ধারণ করে থাকে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের নিয়োগকর্তারা এই বেতন কাঠামো মানেননি। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, অনেক পোষাক কারখানা আইন সিদ্ধ সর্বনিম্ন মজুরি দেয়নি। ছোট ছোট অনেক পোশাক কারখানায় শ্রমিকরা দেরীতে তাদের মজুরি পেয়েছেন এবং তিন মাসের শিক্ষানবিশি কাল পেরিয়ে যাবার অনেক পরেও অনেক শ্রমিক শিক্ষানবিশি কালের বেতন পেয়েছেন। 'আইসিএফটিইউ' জানায়, ফেব্রুয়ারী ২০০১ সাল থেকে পরিচালিত আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন জরিপে দেখা গেছে বস্ত্র খাতের ২১.৭ % শ্রমিক সবচেয়ে কম বেতন পেয়েছেন। রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় কর্মরত শ্রমিকরা যে মজুরি পেয়েছেন, বাইরের শ্রমিকরা সাধারণতঃ তার চেয়ে কম মজুরি পেয়েছেন। কারখানার এক জন দক্ষ শিল্প শ্রমিকের ঘোষিত মাসিক ন্যূনতম মজুরি হলো ইপিজেড এলাকায় ৬৩ ডলার (৩,৪০০ টাকা) ইপিজেড এলাকার বাইরে ৪৯ ডলার (২,৬৫০ টাকা)। এই মজুরি একজনের ন্যূনতম জীবন মান বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট হলেও তা পরিবার নিয়ে শোভনীয় জীবনমান রক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়।

আইনে এক দিনের ছুটিসহ ৪৮ ঘন্টার কর্ম সপ্তাহ নির্ধারণ করা হয়েছে। সর্বাধিক ১২ ঘন্টার ওভারটাইমসহ ৬০ ঘন্টার সপ্তাহও অনুমোদন করা হয়েছে। গেঞ্জী কারখানা ও পোশাক কারখানার মতো শিল্পগুলোতে এই আইন তেমন কার্যকর করা হয় না।

কারখানা আইনে কর্মস্থলে নামমাত্র স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা মানদন্ড স্থির করা হয়েছে। এই আইন ব্যাপক, কিন্তু নিয়োগকারীরা তা বহুলাংশে উপেক্ষা করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, পোশাক শিল্পে অগ্নি নিরাপত্তা বিধির অনেক লঙ্ঘন ঘটতে দেখা যায়। অনেক কারখানা এমন সব ভবনে স্থাপিত, যেগুলো শিল্পকাজের উপযোগী করে নির্মিত হয়নি। আপৎকালে বিপুল সংখ্যক শ্রমিককে সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থাও

সেগুলোতে নেই। ২০০০ সালের নভেম্বরে একটি কারখানায় আগুন লাগলে বেরিয়ে যাওয়ার পথে তালা থাকায় ১০ জন শিশুসহ ৪৮ জন পোশাক শ্রমিক নিহত হন এবং আরো শতাধিক আহত হন।

২০০১ সালের আগস্ট মাসে একটি পোশাক কারখানায় অগ্নিকান্ডের বিপদ সংকেত শুনে দ্রুত বেরিয়ে যাওয়ার সময় বহির্গমন পথে পদপিষ্ট হয়ে মারা যান ১৮ জন শ্রমিক। কেননা বের হবার এই পথটি খুলছিল না। আইনের বিধান কার্যকর করার জন্য শ্রমিকরা আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারে। কিন্তু গুটিকয়েক মামলার বিচার সম্পন্ন হয়। শ্রম মন্ত্রণালয়ের শ্রম পরিদর্শকদের সংখ্যাল্পতা ও তাদের মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি ও অযোগ্যতার কারণে তাদের দ্বারা আইন প্রয়োগ জোরালো নয়। বেকারত্বের উচ্চ হার এবং আইনের অপর্যাপ্ত প্রয়োগের কারণে বিপজ্জনক কাজের পরিবেশ সংশোধনের দাবী করলে বা বিপজ্জনক বলে অনুমিত কাজে অংশগ্রহণের অস্বীকৃতি জানালে শ্রমিকদের চাকুরি হারানোর ঝুঁকি থাকে।

চ. মানুষ পাচার

মানুষ পাচার আইনত নিষিদ্ধ। কিন্তু মানুষ পাচার একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে রয়েছে। প্রধানতঃ পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে মূলত ভারত, পাকিস্তান ও দেশের অভ্যন্তরেই ব্যাপকভাবে নারী ও শিশু পাচার করা হয়। শ্রম দাসত্বের জন্য মানুষ পাচারের কিছু দৃষ্টান্তও রয়েছে। উটের জকি হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কিছু শিশুকে মধ্যপ্রাচ্যে পাচার করা হয়।

অনৈতিক ও অবৈধ কাজে ব্যবহারের জন্য শিশু পাচারের দায়ে মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডের বিধান রয়েছে। তবে খুব কম সংখ্যক অপরাধীরই বিচার হয়েছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো ছাড়াও বাংলাদেশ ন্যাশনাল উইমেন লইয়ারস অ্যাসোসিয়েশন বা 'বিএনডবুএলএ', অধিকার, এসিডি, আহসানিয়া মিশন এবং 'আইএনসিআইডিআইএন'সহ বেশ কিছু এনজিও পাচারকৃত শিশু উদ্ধার কাজে ও অন্যান্য সহযোগিতা করেছে। আলোচ্য বছরের প্রথম ছয় মাসে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো দেশের ভেতর থেকে ১শ' ৩টি পাচারকৃত শিশুকে উদ্ধার করেছে এবং 'বিএনডবুএলএ' দেশের ভেতর থেকে ২৫টি এবং দেশের বাইরে থেকে ১৪টি পাচারকৃত শিশুকে উদ্ধার করেছে। আলোচ্য বছরে ১শ' ৬৩ জন অভিযুক্ত পাচারকারীকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়েছে। 'বিএনডবুএলএ' নারী ও শিশু পাচার সংক্রান্ত ১শ' ২৯টি মামলা পরিচালনা করেছে এবং বছরের প্রথম অর্ধেক সময়ে নয়টি মামলায় ২৩ জন পাচারকারীকে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

এই অপরাধে ঠিক কতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে সে খবর জানা কষ্টকর, কেননা, পাচারকারীদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয় তা অপেক্ষাকৃত কম অপরাধের জন্য -- যেমন অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করা, ইত্যাদি। ৬ই সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে সেন্টার ফর উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন স্টাডিজ (সিডব্লুসিএস)-এর পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে বলা হয়, পাচারকৃত শিশুদের এক শতাংশ এবং অপহৃত শিশুদের ৫৫ শতাংশকে ২০০০ সালের জানুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যে উদ্ধার করা হয়। সিডব্লুসিএস-এর তথ্য অনুযায়ী পাচারকৃত ছেলেদের অধিকাংশেরই বয়স দশ বছরের নিচে এবং পাচারকৃত মেয়েদের অধিকাংশেরই বয়স ১১ থেকে ১৬-র মধ্যে।

সরকার পাচার সমস্যার ব্যাপারে নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে এবং এই সমস্যা মোকাবিলায় কয়েকটি মন্ত্রণালয়কে নিয়ে একটি কার্যক্রমের সূচনা করেছে। আদম পাচারের দায়ে গ্রেফতার ও

বিচার কাজ লক্ষ্যণীয়ভাবে বেড়েছে, জাতীয় পাচার প্রতিরোধ অভিযান শুরু করা হয়েছে যাতে এ সমস্যা সম্পর্কে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা যায়। তবে এ সমস্যা সমাধানে সরকারের সীমাবদ্ধতা রয়েই গেছে। পাচার বিরোধী সরকারী প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রচার, গবেষণা, লবিং, উদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রম। পাচারকৃতদের মধ্যে যারা ফিরে এসেছে, তাদের সরকার সহায়তা দেয় তবে সরকার পরিচালিত আশ্রয় কেন্দ্রগুলো অপর্যাপ্ত এবং সেগুলো দুর্বলভাবে পরিচালিত।

পাচার সমস্যা মোকাবিলায় একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় অবকাঠামো গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সরকার নরওয়েজীয় সাহায্য সংস্থা নোরাডের সংগে ২০০০ সালের জুনে ২০ লাখ ডলারের (১০ কোটি ৮০ লাখ টাকা)– তিন বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষর করে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক দফতর ভিত্তিক এই প্রকল্প হবে সরকারের বিচার, নারী ও শিশু রক্ষা এবং পাচার প্রতিরোধ কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু। প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল সরকারকে পাচারকারীদের গ্রেফতার ও বিচার করার ব্যাপারে আরো সংশিষ্ট করা। যেহেতু, গ্রাম পর্যায়ে সরকার জন্ম ও বিয়ের কোন রেকর্ড রাখে না; সে কারণে বিয়ে বা পারিবারিক বন্ধন সম্পর্কে মিথ্যা দাবী নির্ণয় করা কর্তৃপক্ষের জন্য দুরূহ ব্যাপার ছিল। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু নারী পাচার মামলার বিচার হয়েছে। নোরাডের এই প্রকল্পের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো উদ্ধার হওয়া নারী ও শিশুদের জন্য আরো আশ্রয়স্থল এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

ঠিক কত সংখ্যক নারী ও শিশুকে পাচার করা হয়েছে তার কোন সঠিক হিসাব নেই। তবে মানবাধিকার পর্যবেক্ষকরা হিসাব করেছেন যে, পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ২০ হাজারের বেশি নারী ও শিশুকে দেশ থেকে পাচার করা হয়। ভাল চাকুরি বা বিয়ের লোভ দেখিয়ে অধিকাংশকে পাচার করা হয়। কাউকে কাউকে দেশের বাইরে দাস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দারিদ্র্যের চক্র থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথ না পেয়ে কোন কোন পিতামাতা কখনো কখনো স্বেচ্ছায় তাদের ছেলেমেয়েদের অন্যত্র পাঠায়। অবিবাহিত মা, এতিম বা স্বাভাবিক পারিবারিক ছত্রছায়ার বাইরে যারা, তাদেরও পাচার হয়ে যাওয়ার বেশি ঝুঁকি থাকে। বিদেশে বসবাসকারী পাচারকারীরা কোন গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হয় কোন মেয়েকে বিয়ে করে গন্তব্যে গিয়ে বিক্রি করে দেয়ার উদ্দেশ্যে। নতুন "বন্ধু" বা "স্বামীর" কাছে বিক্রি করে দেয়া মেয়েটিকে জোর করে লাগানো হয় শ্রম দাসত্বে, দৈহিক কাজে বা পতিতাবৃত্তিতে। অপরাধীদের চক্রগুলোও কিছু মানুষ পাচারের কাজে নিয়োজিত থাকে। ভারতের সংগে সীমান্তে, বিশেষ করে যশোর ও বেনাপোল সীমান্তে, নিয়ন্ত্রণ শিথিল থাকায় সহজেই অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করা যায়।

শিশু পতিতার সংখ্যা কত তা নির্ণয় করা কঠিন। পতিতাবৃত্তি আইনসিদ্ধ; কিন্তু, কেবল ১৮ বছরের বেশি বয়সের কেউ সরকারী সার্টিফিকেট নিয়ে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত হতে পারে। বয়স সম্পর্কে মিথ্যা বিবরণ দিয়ে এই বিধানকে সহজেই এড়ানো হয়েছে। পতিতাবৃত্তিতে নামানোর জন্য যারা অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের সংগ্রহ করে তাদের কদাচিৎ বিচার হয় এবং বিপুল সংখ্যক অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে পতিতালয়ে কাজ করে। পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে নারী পাচারের দায়ে ১০ বছরের কারাদন্ড থেকে মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত দেয়ার বিধান রয়েছে। মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের বিশ্বাসযোগ্য খবর অনুযায়ী পুলিশ ও স্থানীয় সরকার কর্মকর্তারা প্রায়ই নারী ও শিশু পাচার উপেক্ষা করে থাকে। চোখ বুঁজে থাকার জন্য তাদের সহজেই ঘুষ দেয়া যায় (অনুচ্ছেদ ১.গ ও ৫ দ্রষ্টব্য)।

শিশুদের, সাধারণত অল্প বয়স্ক ছেলেদের উটের জকি বা সহিস হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মধ্যপ্রাচ্যে পাচার করা হয়। হিসাব করা হয়েছে যে, একমাত্র সংযুক্ত আরব আমীরাতেই উটের জকি হিসাবে ১০০ থেকে সহস্রাধিক দক্ষিণ এশীয় অল্প বয়স্ক বালক কর্মরত রয়েছে। এদের অধিকাংশ ভারত ও পাকিস্তান

থেকে আসলেও বাংলাদেশ থেকে আসার সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরাধী চক্রগুলো এদের সংগ্রহ করে। এই সব ছেলেদের অধিকাংশ তাদের পিতামাতাদের জ্ঞাতসারে কাজ করে। পিতামাতারা তাদের সন্তানের শ্রম হিসেবে ২০০ ডলার (১০ হাজার টাকা)–এর মতো পেয়ে থাকে। অবশ্য কিছু সংখ্যক ছেলেদের অপহরণ করে নেয়া হয়। যে সব অপরাধী চক্র এই ছেলেদের পাচার করে নিয়ে আসে তারা প্রতিটি ছেলের শ্রম থেকে প্রতি মাসে ১৫০ ডলার (৭৫০০ টাকা) আয় করে থাকে। এই সব ছেলেমেয়ে পাচার করে আনার একটি প্রচলিত পদ্ধতি হলো মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশের ভিসা আছে এমন কোন বাংলাদেশী বা ভারতীয় মহিলার পাসপোর্টে এই সব ছেলের নাম যুক্ত করা। আলোচ্য বছরে পুলিশ মধ্যপ্রাচ্যে অল্প বয়স্কদের পাচারের কয়েকটি ঘটনায় বেশ কয়েক জনকে গ্রেফতার করে। বছরের শেষ নাগাদ এই মামলাগুলো আদালতে ঝুলছিল।

এই মর্মে বিশ্বাসযোগ্য রিপোর্ট রয়েছে যে আলোচ্য বছরে পুলিশ শিশু ও নারী পাচারে সহায়তা করেছে। যখন পাচারকারীরা সীমান্তে মানুষ পাচার করার সময় ধরা পড়ে, তখন পুলিশ প্রায়ই নির্লিপ্ত থাকে। পুলিশ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে মানুষ পাচারের পরিবর্তে "পাসপোর্ট জালিয়াতি" অথবা জাল কাগজপত্র পেশ করার অভিযোগ দায়ের করে। একটি শিশুকে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগের উদ্দেশ্যে পাচার করার অভিযোগ প্রমাণিত হলে পাচারকারীকে সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়ার বিধান আইনে রয়েছে।

অনেক এনজিও এবং সামাজিক সংগঠন প্রতিরোধ প্রচেষ্টা, গবেষণা, উপাত্ত সংগ্রহ, ডকুমেন্টেশন, প্রচার, সচেতনতা সৃষ্টি, নেটওয়ার্কিং, আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতা, আইন প্রয়োগ, উদ্ধার, পুনর্বাসন, পাচারকৃতদের সমাজে আত্মীকরণ, তাদের উপার্জনের ব্যবস্থা করা ও স্বল্প সুদে ঋণ কার্যক্রম, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণদান এবং আইনের সংস্কারের মতো উদ্যোগের মধ্য দিয়ে পাচার সমস্যা নিয়ে কাজ করছে।

পাচার বিরোধী একটি জাতীয় নেটওয়ার্ক 'অ্যাকশন এগেইনস্ট ট্রাফিকিং অ্যান্ড সেক্স্যুয়াল এক্সপয়টেশন অব চিলড্রেন' (এটিএসইসি) সম্প্রতি বেশ কয়েকটি পাচার বিরোধী কার্যক্রমের বাস্তবায়ন শুরু করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে এনজিও এবং সরকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি করা, জাতীয় পাচার বিরোধী এজেন্ডাকে এগিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে তার লক্ষ্য নির্ধারণ করা, এ বিষয়ে উপাত্ত লেনদেনের উদ্দেশ্যে একটি রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা এবং তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠনগুলোতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা। তাছাড়া, এটিএসইসি সমাজে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে পাচার প্রতিরোধ বিষয়ে সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল বাণীও রচনা করছে। এই কার্যক্রমের আওতায় সকল সংবাদ মাধ্যমকে ব্যবহার করে জাতীয় ভিত্তিতে প্রচার চালানোর উপযোগী বিষয়বস্তু প্রণয়ন ও সেগুলো পরীক্ষা করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে সকল স্তরে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কর্ম শিবির ও সভার আয়োজন করা, বিদ্যালয়ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করা, সারা দেশে একটি ভ্রাম্যমান প্রচার কাজ পরিচালনা করা এবং সীমান্ত এলাকায় একটি বিজ্ঞাপন প্রচার কাজ চালানো।

অ্যাসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট পাচার সমস্যার ওপরে একটি সমীক্ষা চালিয়েছে এবং কর্মশিবির ও সচেতনতা কর্মসূচী পরিচালনা করেছে। পাচারের শিকার হওয়ার আগেই এই কর্মসূচী যাতে সম্ভাব্য শিকারদের কাছে পৌঁছে সে কার্যক্রম তাদের রয়েছে। বাংলাদেশ ন্যাশনাল উইমেন লইয়ারস অ্যাসোসিয়েশন (বিএনডবিউএলএ) লিফলেট, স্টিকার ও পোস্টার বিলি করে পাচারের বিপদ সম্পর্কে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। 'বিএনডবিউএলএ' পাচারের শিকার ব্যক্তিদের আইনগত সহায়তা দেয় এবং পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত কার্যক্রম নিয়ে থাকে। পাচারকৃত মহিলা ও শিশুদের জন্য এই সংস্থার একটি আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে। সেখানে তাদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরামর্শ, ও

প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সেন্টার ফর উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন (সিডবিউসিএস) সারা দেশে পাচারের ওপর নজর রাখে, সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সভার আয়োজন করে এবং নারী ও শিশুদের অধিকার সম্পর্কে পুলিশদের সচেতন করার জন্য তাদের একটি পাইলট প্রকল্পও রয়েছে। পাচার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিষয়টি প্রায়ই সংবাদপত্রে স্থান পাচ্ছে। পাচারবিরোধী এনজিওগুলোর মধ্যে সমন্বয়কারী দুটি সংগঠন রয়েছে। এরা এই সমস্যার বিরুদ্ধে বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে অধিকতর সমন্বয় সাধন এবং পরিকল্পনার কাজে নিয়োজিত।

পাচার রোধে বিগত বছরে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। সরকার সহ সংশিষ্ট সকল প্রধান পক্ষ একটি অভিন্ন, সমন্বিত কর্মসূচী প্রণয়নে এগিয়ে এসেছে। এছাড়াও, আঞ্চলিকভাবে পাচার সমস্যা মোকাবিলায় নানা এজেন্সী একটি প্রস্তাবিত কর্ম পরিকল্পনা নিয়েছে।

==========

wRAvi/ 2003

`óe¨: GB wbe‡Üi Bs‡iwR fvl¨ ÔA¨v‡gwiKvb †m›Uvi Ô-G cvIqv hv‡e| hw` Avcwb Bs‡iwR fvl¨wU †c‡Z AvMnx nb, Z‡e ÔA¨v‡gwiKvb †m›Uvi Ô-Gi †cm †mKk‡b (†Uwj‡dvb: 8813440-4, d¨v·: 9881677; B-‡gBj: dhaka@pd.state.gov Ges Website: http://www.usembassy-dhaka.org) †hvMv‡hvM Ki"b|